প্রবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের চিঠি-পার্লবাককে

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অনেক নারীই তোমার মতো পেয়েছে। তাদেরকে জানি, পড়েছি, ভালো লেগেছে। গুণগ্রাহিতা দেখিয়ে তাঁদের উপর বা তাঁদের বইয়ের উপর প্রবন্ধ লিখতেও পারি। তবু বলবো, তোমাকে যত ভালবাসি, তাদেরকে তত বাসি না। তাদেরকে যে প্রেম-সিক্ত শ্রদ্ধা দেবার কথা কখনো ভাবি না, তোমাকে তা-ই দিতে পারি অক্লেশে।

এর কারণ জানো? তাঁরা কথাসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। সে সৃষ্টি করেছ তুমিও। তবু তোমাদের মধ্যে তফাৎ অনেক।

সমালোচকেরা বলবেন : তাঁরা মানুষ সৃষ্টি করেছেন; প্রজ্ঞার উত্তাপে তাদের ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রিত করেছে মানুষকে, মানুষের মনকে। সে-মানুষ নিজের পরিবারে বা কাহিনী-সংশ্লিষ্ট মহলে পরিচিত। সে-মানুষ শুধুই মানুষ। তার নাড়ি টিপলে তার একক বিকাশের স্পন্দনই উপলব্ধ হবে। জাতির মর্মজড়ানো মন ও বুদ্ধি সে পায়নি। তার জাতির প্রতিনিধি সে নয়। তুমি যাদের সৃষ্টি করেছ, তারা একটা মহাজাতির এক একজন প্রতিনিধি। তাদের সৃষ্টি যদি মহৎ, তো তোমার সৃষ্টি মহত্তর। তাদের সৃষ্টি মননকেন্দ্রিক, ব্যক্তি বা সমাজকেন্দ্রিকও বলতে পারো, আর, তোমার সৃষ্টি একটা মহাজাতির আত্ম-কেন্দ্রিক। তুমি তাদের থেকে পৃথক।

এহো বাহ্য। এদেশের যারা তোমার গুণমুগ্ধ, তাদের কেউ কেউ বলতে পারে : তোমার ঘরের চারপাশে সৃজনের এত সব উপাদান পড়ে থাকতে, একটা অবজ্ঞাত, অনগ্রসর, অপরিচ্ছন্ন অতিকায় জাতির স্বরূপ রূপায়নের সংকল্প নিয়ে তুমি লেখনী ধরেছিলে। শাদা egoist-দের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার যে স্বাজাতিক স্পীরিট, তার মত্ততা তোমাকে প্রমত্ত করার অবকাশ পায়নি। ভেতরে মার্কিনী রক্ত, বাইরে প্রতীচ্য শুভ্রতার নির্ভেজাল উপায়ন তোমার মনকে বেঁধে রাখতে পারেনি; নিঃস্ব, অমার্জিত চৈনিক জীবন যেমন তোমাকে নাড়া দিয়েছিল। (ওদের মাঝখানে দীর্ঘজীবন কাটিয়েছ, তারই কি ফল এটা? এমন তো অনেক শ্বেতাঙ্গ কালাদের মাঝে বাস করে যায়, তারা তো কই এমন পারে না!)

শুধু খ্যাতির লোভ নয়, তারও উপরের অনেক কিছু ছিল তোমার মনে। আর সব নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তাদের থেকে তাই তুমি আলাদা!

কিন্তু এই কি যথেষ্ট? না দিদি।

তুমি কথাশিল্পী হয়েও যুগের রাজনীতির সঙ্গে তাল রেখে চলেছ। ব্যক্তি ও সমাজকে রূপবান করে দিয়ে তারা মুছে না গেলেও নিত্য বর্তমানের টপ্‌কিস এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়বস্তু তারা ঠিক নয়। তাদের সৃষ্টিও তা নয়। তাদের সৃষ্টি বিশ্বসাহিত্যের বুকে এক একটা স্থান চিহ্নিত করে রেখেছে, কিন্তু তোমার সৃষ্টি এমন একটা উৎসের মুখ খুলে দিয়েছে, যার থেকে একটা মহাজাতির প্রাণধারা উৎসারিত হচ্ছে, আজও, আগামী কালের জন্যও। তুমি মেয়ে হয়ে মেয়ের কাজ সমাধা করেই ক্ষান্ত হওনি, পুরুষের কাজও করে যাচ্ছো। এই খানেই তোমার স্বাতন্ত্র্য!

অবশ্য সাহিত্যসৃষ্টি মাত্রই মেয়ের কাজ নয়; কাজটা পুরুষেরও, কিন্তু কি জানি কেন ধারণা জন্মে গেছে, রাজনীতিটা হচ্ছে পুরুষের কাজ। অ্যানি, এলিজাবেথ, ভিক্টোরিয়া, র‍্যাথবোন এরা রাজনীতিকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া সত্ত্বেও এরা মানব জাতির–সম পরিমাণে পুরুষ ও নারীর প্রতিনিধির কাজ করতে পারছেন না–চার্চিল, রুজভেল্ট, গান্ধী, স্টালিন, হিটলার-এর মতো লোককে দেখে, এবং তাঁদের মতো রাষ্ট্রপ্রাধান্য কোনো নারীকে লাভ করতে না দেখেই কি এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে? তুমি বিচার করো।

সবটুকু বলা হলো না।

তোমার লেখনী যে মানুষগুলিকে সৃষ্টি করেছে, ঘটনাবর্তের মাঝে তারা নিরুপায়। তাদের দৈন্য আছে, ঈর্ষা আছে, সুখ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে। সকল ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝে বেঁচে থাকার দুর্বার প্রচেষ্টা আছে। এক কথায়, তাদের জীবন আছে; তারা মানুষ। দেবতার মতো সহজলভ্য সুখ পাওয়ার কল্পনা-বিলাস তাদের চোখে স্বপ্নেও কোনোদিন ধরা দেয়নি। তারা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে; প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সাথে শক্তি-পরীক্ষা করে-করে, বহু যুগের অভ্যাসের দরুন আপনা থেকেই তারা কঠিন হয়ে উঠেছে। নিত্যদিনের আঘাত তাদের এমন দুর্বার করে তুলেছে যে, মৃত্যুর আঘাতও তাদের ঘাতসহ বুকে আতঙ্কের সৃষ্টি করে না।

এদের বুক যে দিয়েছে–জানি না সে কোথায়– সে এদের দুঃখ দিতে ভুল করেনি; অধিকন্তু, এদের পাছে পাছে মৃত্যুকে লেলিয়ে দিয়েছে। এরা মরে। পঙ্গপাল এসে এদের শ্রমের ফসল নষ্ট করে। দুর্ভিক্ষ এসে উজাড় করে নিয়ে যায়। পাছে পাছে লেলিয়ে দেওয়া মৃত্যুকে উপেক্ষা করে দলে দলে শহরে যায়। ভিক্ষা করে। লাথি ঝাঁটা খায়। শহরে চোর-বাটপাড়ের হাতে লাঞ্ছিত হয়। লুঠতরাজ করে। গুলি খায়। তবু বেঁচে থাকতে চায়। দেব-লাঞ্ছনা উপেক্ষা করে কর্মযোগের ভেতর দিয়ে করে যায় বেঁচে থাকবার দুশ্চর সাধনা। একখণ্ড ভূমিকেও হাতছাড়া করে না। প্রতীতি দৃঢ়তর হয়, জানে, নূতন দিনের আলো অবশ্যই আসবে।

এই আশায় বুক বাঁধার ইঙ্গিত তুমি দিয়েছ। তারই তরঙ্গিত সঙ্গীত একটা একক জাতির, অনন্য জাতীয় সত্তাকে আন্তর্জাতিকের পর্যায়ে তুলে এনেছে। একটা দেশের সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের ক্লাসিক সুর ডেকে নিয়ে কাছে বসিয়ে ঘরোয়া খবর জিজ্ঞেস করেছে।

শুধু তাই নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের প্রতিদিবসের দুঃখ-যন্ত্রণা বেড়ে চলেছে। এর সাথে অবিরত সংগ্রাম করে মানুষ কার্যত দুর্বল হয়ে পড়েছে। তুমি দেখিয়েছ : প্রকৃতি এই মানুষগুলিকে ধ্বংস করার জন্য নিত্যনিয়তই যেন একটা যম-দণ্ড উঁচিয়ে রেখেছে। সে অমোঘ দণ্ডকে উপেক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গেই vested interest-এর সঙ্গেও তাদের মৃত্যু সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। সে-সংগ্রাম প্রাকৃতিক বিপর্যয় অপেক্ষাও সাংঘাতিক। কারণ তা সদর-দরজা দিয়ে মার-মুখো হয়ে এসে সন্ত্রস্ত ও সশস্ত্র হবার সুযোগ দেয় না। সে আসে সিঁদেল চোরের রূপ নিয়ে, আঁধারে, ঘরের কোণ ঘেঁষে।

নৈসর্গিক উপপ্লব, অজন্মা, প্লাবণ, অনাহারের সুযোগ নিয়ে সে interest দুই রূপে এসে সাঁড়াসী বার করে—এক, নগণ্য দাদনে মানুষের অমূল্য শ্রম-শক্তিকে কিনে নেয়; দুই, অবস্থার সুযোগে মানুষের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদকে নামমাত্র অর্থ দিয়ে হাতিয়ে নেয়।

শুধু এ-দুটির সঙ্গে যুদ্ধ করে মানুষের পক্ষে হয়ত ভারসাম্য রক্ষা করে চলা সম্ভবই হতো। কিন্তু এক বৃহত্তর, ব্যাপকতর vested interest তাদের উপর যে স্টিমরোলার চালাচ্ছে, তার চাপে তারা নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। বুক পিষে যাচ্ছে—তাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ক্ষুদ্রতর স্বার্থরাশির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি ক্রমেই শুষে নিচ্ছে।

এই শেষোক্ত শক্তির শক্তিশোষণের কথা তুমি তোমার সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিগুলোর ভেতরে স্থান দেবার সুযোগ পাওনি; পাওনি উপযোগিতাবোধ। কারণ, সে-শক্তির নগ্নতাটুকু এতদিন প্রকাশ পায়নি। রেশমী আবরণে প্রচ্ছন্ন ছিল।

এবারের যুদ্ধ সে-পর্দা ফাঁক করে দিয়েছে।

তোমার সব চেয়ে বড়ো বিশেষত্ব এইখানে। এর জন্যে যেটুকু গলতি তোমার সাহিত্যে ছিল, সময়ের পরিণতিতে তা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে তুমি বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে ফেলেছ। অর্ধমৃত মহাচীনের বুকে জাপ-শকুনির মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার যে উৎসব চলছে, তারি সঙ্গে সঙ্গে, বরং আরো আগে থেকে, ইঙ্গমার্কিন vested interest-এর রক্তমোক্ষণ-কার্য পুরোদমে ও পূর্ণ-উদ্যমে চলে এসেছে, এবং মহাচীনকে বাঁচাতে হলে, তা যে চলা আর উচিত নয়, এ-দাবী তুমিই বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে তোমার সাহিত্যজগতের খেলাঘরের জীবন্ত পুতুলগুলিকে, হে মার্কিনবাসিকে, রক্ষার কাজে তুমি চেষ্টাবতী হয়েছ।

সর্বোত্তম তুমি এইখানটায়, যেখানটাতে দেখছি, যুদ্ধাস্ত্রকে ব্যাহত করার মিথ্যা একটা দোষারোপ করে, তোমার কণ্ঠ রোধ করার জন্য সেই One & unique vested interest ভরসাই পাচ্ছে না। এত বড় একটি ব্যক্তিত্ব তুমি নিজের জন্য ধরে রাখতে পেরেছ।

আজকের দিনে ব্যক্তিত্বের বড়ো দুর্দশা : মহাস্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দাও, দেখবে, সে-স্রোত আবর্তের বুকেও তোমার ব্যক্তিত্বকে করুণায় ঠিক রাখছে; বেঁকে বসো, তা হলে দেখবে সে-ব্যক্তিত্ব খণ্ড খণ্ড হয়ে ধুলোয় মিশে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা তো মানুষ সৃষ্টি করেই খালাস; তুমি তা নও। সৃষ্ট মানুষগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভবিষ্যতে সংগ্রাম করার কথা তারাতো কেউ কল্পনায়ও আনতে পারেনি। কিন্তু তাদের থেকে তুমি আলাদা।

উক্ত দুই শ্রেণির, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ vested interest ভারতবর্ষকে কোথায় নিয়ে এসেছে তা তুমি, যদিও ভারতে বাস করনি কখনো, হয়ত অনুমান করতে পারবে। এই সময়ে এখানে থাকলে তুমি একখানা নূতন Good Earth লিখতে পারতে। সে হতো মহাচীনকে নিয়ে লেখার চেয়েও বেশি চমকপ্রদ, মর্মস্পর্শী ও মর্মদাহী। কারণ, আজিকার মৃত মহাভারত বিশ্বের সর্বশেষ, সর্বাধুনিক সমস্যার শাণিত আঘাতে জুরজুর। নিঃশেষে মরে যেতে পারছে না। তার উপর বিভীষণের চির-অমরতার অভিশাপ বর্তে আছে। সে কখনো মরবে না। শুধু ভুগবে; না পাবে ওষুধ, না পাবে পথ্য–পাবে খালি পদাঘাত আর গালি-গালাজ।

পথ চলতে লক্ষ অন্নহীনের ভিড় ঠেলতে হয়। তারা যেন তোমার Good Earth-এর চিত্রিত মানুষগুলিরই প্রতিচ্ছবি। না খেতে পেয়ে দলে দলে শহরের পথে পাড়ি দিয়েছে। কতক মরে কতক বেঁচে শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত সুস্থ মানুষের সহানুভূতি পাবার আশায় নানারকম সুর তুলে কাতরাচ্ছে। শিল্প কারখানাগুলিতে কাজ করে যারা যথেষ্ট বিড়ি টানবার পয়সা পাচ্ছে, তাদের মুখ-নিঃসৃত জ্বলন্ত বিড়ির শেষাংশের জন্য কাড়াকাড়ি করে। তাদের নারীদের কাপড় নেই; সেইদিকে চোখ রেখে ওরা বিড়ির টুকরো ফেলে হাসতে হাসতে চলে যায়।

অফিস ফেরতা ক্লান্ত বাবুদের মুখনিঃসৃত আমের আঁটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে ঐ নারীরা শীর্ণ শিশুগুলির মুখে পুরে দেয়। আমের দাম বেড়ে গেছে। আঁটি দুষ্প্রাপ্য। ডাস্টবিনের পচাগলা কুকুর-বিড়াল ইঁদুরের মাংসের সঙ্গে মিশে আছে যে খাদ্যকণিকা, স্বর্ণ-রেণু, অনুসন্ধানের অভিনিবেশ নিয়ে তাই তারা খুঁজে বার করে। সাহেব বাড়ির চাকর ডাস্টবিনের পাশে দাঁড়িয়ে পরিত্যক্ত পচা রুটির টুকরো ছিটিয়ে দেয় কাদার উপর। তাই নিয়ে ওরা কাড়াকাড়ি মারামরি করে। ধরতে না পারলে গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দেয়।

তারপর, এই করে কিছুদিনের পর সবটুকু জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলে, ফুটপাথের উপরে র‍্যাফেলওয়ালের আড়ালে শুয়ে পড়ে; একটা ব্যঙ্গের হাসি রেখে মরে যায়। আরো দুঃখের বিষয়, তাদের বিকৃত দেহগুলোকে যথাসময়ে সরিয়ে নেবার মতো সভ্য নাগরিক ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত আমাদের নেই।

যদি আসতে একবার আমাদের দেশে, তবে দেখতে পেতে, বই লেখার কি চমৎকার উপাদান–রাশি রাশি জমাট বাঁধা মাল মসলা এখানে পড়ে আছে। আমাদের তেমন দৃষ্টিশক্তি নেই। তাই এতসব দৃশ্যকেও উপেক্ষা করে আমরা ঠিক বেলা দশটায় আহার সমাধা করি, রাইটার্স বিল্ডিংসগামী ট্রামে পান চিবুতে চিবুতে উঠে, 'আনন্দবাজারে'র ভাঁজ খুলি। বেশ আছি আমরা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাচীনকে নিয়ে যে-সৃষ্টি তুমি করেছ, সে-সৃষ্টির সাথে, মহাভারতে বশে যা সৃষ্টি করতে তার সব ব্যাপারে মিলে গেলেও, কয়েকদিক থেকে মিলতো না–তা জানিয়ে রাখছি। জেনে রাখো : এরা শহরে এসে ভিড় করেছে সত্যি, কিন্তু লুঠতরাজ এরা করবে না কোনো কালে। ক্ষুদ্রতর vested interest-কে রক্ষা করা বৃহত্তর vested interest-এরই কর্তব্য। তাই চীনে তোমার চীনা Good Earth-এ যেমন হয়েছে।

> "এখানে তারা লুঠপাট করলে তাদের উপর হয়ত লাঠি-গুলি সবই চলবে, এবং তাদের বর্তমান অবস্থা সেই লাঠি গুলি অপেক্ষা অধিক লোভনীয় মনে করবার কারণ নেই বলে তারা কি জানে না? তবু তারা এ-কাজ করবে না। এ তাদের ধাতে নেই বলে করবে না। একটা প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের দুই শতাব্দী ব্যাপী জড়ানোর চাপে এরা দুর্গতি-অবসানের দুঃসাহস হারিয়ে ফেলেছে।"

– তুমি যদি আগাম এই কথা লিখে দাও তোমার বইতে তা হলে সে-বই বাজেয়াপ্ত হবে। তোমার প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভারতবর্ষে দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্ররোচনা দেওয়ার অজুহাতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি না পেয়ে, তুমি বরং আন্তর্জাতিক অখ্যাতিই পাবে। অথচ দেশে যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপাদান নীতির বলে জিইয়ে রাখছে, সীজারের স্ত্রীর মতো তারা সর্বদোষমুক্ত।

আরো একটা কথা ধরে রাখো : যে-সমস্ত বই চীন সম্বন্দে লিখে তুমি নোবেল পুরস্কার পেয়েছো, সে-বই ভারতবর্ষকে নিয়ে লিখলে, তুমি আর যাই পাও নোবেল পুরস্কার যে পেতে না, তা বিনা দ্বিধায় বলার অধিকার আমাকে তুমি দিতে পারো। কারণ আমাদেরকে তুমি যতখানি জানো না, আমরা নিজেরা ততখানি জানি বলেই বলছি, তোমার খ্যাতি তাতে বিলেত পর্যন্ত পৌঁছত কিনা সন্দেহ।

আচ্ছা দিদি, বলতে পারো এই বৈষম্যের কারণ কি? এই বৈষম্যকে যদি তুমি দুষ্টনীতি বলে মেনে নিতে পার, তা হলে বলবে কি আমায়, এর বিরুদ্ধে যুঝতে যাওয়া কি কোনো জাতির পক্ষে অস্বাভাবিক কাজ? তবু তুমি ভারতের ন্যাশনালিস্টদের সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারনি কেন?

কেন, সেকথাও আমরা জানি। রাগ করো আর যাই করো, সত্যের অনুরোধে কয়েকটি তিক্ত কথা বলবো তোমায়।

চীনের কথাই ধরো না কেন। বন্যা এসেছে। হু হু করে জল বাড়ছে। মানুষগুলি সন্ত্রস্ত। তাদের সব সম্বল ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শীতে তারা কাঁপছে। আরো বেশী করে কাঁপছে অত্যাসন্ন মৃত্যুর ভয়ে। এখনি এই মুহূর্তে আর একটা কল্লোলধারা এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। উপায় নেই। তারা আকাশের দিকে চাইছে–এখনি শেষ মরণ-চীৎকার দিয়ে তলিয়ে যাবে। আর একটু–আর একটু–আর একটু–ব্যস্; আর একটু হলেই সব শেষ হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন সময়ে দেবতার আশীর্বাদের মতো এলো একটা নৌকো। তারা মার্কিন। তাতে আছে এক পাদরি। তারা তুলে নিয়ে গেল মরণযাত্রীদেরকে মরণের মুখ থেকে তাদের নৌকোয়।—এমনি ধরনের একটা গল্প কি তুমি লেখনি? কেন তাদের মরে যেতে দিলে না? তাদের মরে যেতে ক্ষতি কি, যদি নিজের চেষ্টায় বাঁচতে না পারলো? বিদেশী মিশনারীর হাতে আত্মিক মৃত্যুলাভ অপেক্ষা সলিলাবর্তে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু অন্তত গৌরবের দিক দিয়ে কম কিসে?

না, তারা মরবে না। vested interest-এর কোন না কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার জন্য তাদেরকে বেঁচে থাকতেই হবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা : বেঁচে থাকার যে আলো তারা দেখতে পেলো চারদিকে ঘনিয়ে আসা মৃত্যুর অন্ধকারে, সে-আলো তাদের আত্মার কোনো বিশেষ সম্পদকে কি কেড়ে নেয়নি? কোনো এক অতি-সূক্ষ্ম আত্মিক বিষয়ে তারা কি একটুখানি, এমনিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়নি যা পূরণ করার ক্ষমতা তাদের নেই, বৃটিশ বা আমেরিকার মতো শক্তিমান রাষ্ট্র তাদের নেই বলে?

তুমি স্বাভাবিক কাজই করেছ। এটুকু না দেখালে তুমি অপূর্ণ থেকে যেতে। এতে তোমার বীর্যের মর্যাদা রক্ষা পেতো না। সত্য কথা বলতে কি বীর্যের এই সবলতাটুকু তোমাতে ছিল বলেই তোমাকে আরো বেশি করে ভালবেসেছি। এতে তুমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়েছ। আন্তর্জাতিক জগতে এই বলিষ্ঠ বীর্যবোধই তোমার 'ভয়েস'কে জোরালো করতে সাহায্য করেছে। তোমার কাছ থেকে এ জিনিসটুকু আমাদেরো শেখা উচিত, দুঃখের সহিত এ স্বীকারোক্তি করছি।

সি. এফ. এন্ডরুজ প্রমুখ মনীষী-মানুষকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি যাঁরা আমাদের হয়ে গিয়ে আমাদের জাতীয়-মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন। তাঁরা একটা পরাধীন দেশের এত উপকার করলেও তোমাদের দিকে চেয়ে বলতে হচ্ছে, তাঁরা বীর্যের অভাব দেখিয়েছেন! মাদাম চিয়াং কাইশেক বেড়াতে এসে কতকক্ষণের জন্য শাঁখা-সিন্দুর পরে বীর্যের অভাবের সাথে আরো একটু দুর্বলতা যোগ করে গেছেন, এও আমাদের বোধগম্য না হবার নয়, তোমাদের তো নয়ই—যদিও বিষয়টি সূক্ষ্ম।

তুমি মার্কিন এ কথা তোমার ভুলে গেলে চলে না। তেমনি আমরা ভারতীয়েরা ভারতবাসী, চীনারা চীনবাসী—এ কথাও ভুলে যাওয়া সম্ভব কি?

—এসব ঠাট্টার কথা হলেও, তোমরাই এসব কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ। অন্তত তোমাদের রাষ্ট্রকর্ণধারেরা তো হামেশাই দিচ্ছেন!

তোমাদের ভারতসচিব আমেরির কথাটা একবার শুনেছো?

"Our whole policy in India, our whole policy in Egypt, stand condemned if we comdemned Japan."

এর সঙ্গে চার্চিল-সাহেবের কথাটাও যোগ কর :

"আমি কি সাম্রাজ্যের দেউলিয়া-গিরিতে সরদারী করতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছি?"—ভারতের স্বাধীনতা-দাবীর এই জবাব!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর ভারতের পক্ষে এই দুই কর্ণধারকে বিশ্বাস করা সম্ভব কি? ভারতের ভবিষ্যৎ এই মানুষ দুজনার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকা, যে-জাতির প্রাণে একটুখানি স্পন্দন আছে, সে-জাতির পক্ষে কেমন করে চলতে পারে? তুমি শাঁখা-সিন্দুর পরে আমাদের হওনি। মিস মেয়োর মতো নর্দমাও ঘাঁটোনি। তোমাকে এ প্রশ্ন করার তাই অসার্থকতা দেখছি না।

ভারতের জাতীয়-আন্দোলন ও উহা দমনের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে চাই না। তুমি বিচক্ষণ, তুমি নিজেই বুঝতে পারো : পৃথিবীর শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষের মৃত্যুপণের বেগ নিয়ে হাত-পা নাড়া দিয়ে ওঠা যেমন নূতন নয়, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তাদেরকে দমিত রাখবার উদ্দেশ্যে পাখির মতো হত্যা করাও পুরাতন ব্যাপার–এ কথা সত্য কি না।

রাজ্য–বা–সাম্রাজ্য–তন্ত্রটাই এমন জিনিস, যাকে টিকে থাকবার জন্যে তাকে আগে রাখতে হয় মর্যাদা রক্ষারও পর্যাপ্ত ভয় দেখাবার ক্ষমতা, তারপর তার রক্তপিপাসু হয়ে ওঠার মতো নৃশংসতা–না হলে তার কণ্ঠ অনেক আগেই জনতার চাপে নিষ্পেষিত হয়ে যেত।

তোমরা বলবে, ভারতের 'ন্যাশনালিস্ট'রা ভুল করেছিল। অবশ্য খাঁটি ন্যাশনালিস্টরাই যে এ-আন্দোলন করেছিল সে-সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ রয়ে গেছে। যেহেতু তাদের ঘাড়ে 'দোষ' চাপানোর পর নিরপেক্ষ, প্রকাশ্য বিচারে বেরিয়ে আসতে vested interest-ধারীরা রাজি নয়, কেন, তার সন্তোষজনক উত্তর দেবারও তোয়াক্কা তারা রাখে না। তবু সরল চিত্তে যারা সব কিছু স্বীকার করতে পারে, তাদের হয়ত স্বীকার করতে কষ্ট হবে না, খাঁটি creed-মাফিক ন্যাশনালিস্ট না হলেও, এ কাজ যারা করেছে, তারা কতকটা ন্যাশনালিস্ট স্পীরিট নিয়ে করেছে একথা হয়ত একেবারে মিথ্যা নয়।

হয় তো তোমাদের কথাই ঠিক যে, তারা ভুল করেছিল। কিন্তু এ কথা তুমি অস্বীকার করে বসবে না তো যে ভুল মানুষেরা করে, প্রেতেরা করে না।–এমত অনেক ভুলেরই মতো এ-ভুলটাও করা সৃষ্টির আদি থেকে মানুষের মজ্জাগত ব্যাধি। আর, এ সব ভুলের জন্য অনেকে পুজোও পেয়েছে, ইতিহাসে তার নজির হয়ত তুমি পেয়েছ। জিজ্ঞাসা করি, যে-ভুল করে মানুষ পুজো পায়, সেই একই ভুলের জন্য মানুষ গুলি খেয়ে কেন মরে! এই গুলি-করে মারাও যে একটা ভুল নয়, তার মীমাংসার জন্য ন্যায়-শাস্ত্রের আশ্রয় নিতে হবে না কী?

আবার বলছি : রাজ্য–বা–সাম্রাজ্য–তন্ত্রটাই এক সাংঘাতিক চীজ। যে শ্রেণির স্বকীয় আদর্শ বজায় রাখতে গিয়ে রোমের সম্রাট নীরো মৃত্যুহীন অগৌরব লাভ করেছেন, যে আদর্শ বয়ে বয়ে রাশিয়ার জার নিজের অজ্ঞাতে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব আসার পথ করে দিয়েছিলেন, বর্তমান যুগের 'ইজমে'র পোষাক পরা সাম্রাজ্য বা নাৎসীপ্রথা কি

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী ৫৬ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারই উত্তরাধিকারী নয়? অবশ্য কালক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের মনোবিকর্ষণের ধাপে ধাপে চলতে গিয়ে তাকে অনেকটা সভ্য ও মার্জিত রূপ নিতে হয়েছে। নিতে হয়েছে বেঁচে থাকবারই প্রয়োজনে।

নীরো বা জারের আমলের ভোঁতা রূপ নিয়ে এই সুসভ্য যুগের মানুষের বুকের উপর দিয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন যে-জিনিসকে ভারে কাটা যেতো, এখন কালের পরিণতিতে এবং মানুষের মন ও চিন্তার পরিবর্তনে, সে-জিনিসকে ধারে কাটতে হয়। এই জন্য সে-অস্ত্রের অগ্রভাগ এখন শক্ত আর সূক্ষ্ম করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, বিশ্বপরিবর্তনের মুখ চেয়েই তার এই পরিবর্তিত রূপ সে গ্রহণ করে আসছে।

এক-একটা মহাযুদ্ধে অনেক কিছু ওলট-পালট করে। এবারের মহাযুদ্ধের পরেও কি বিজ্ঞান, কি সংস্কৃতি, কি সমাজ, কি মানুষের মনোজগতের বিধি-ব্যবস্থা সব কিছুই পরিবর্তিত হয়ে একটা নূতন রূপ নেবে, একথা ঠিক। এবং সেই পরিবর্তিত রূপের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য হয়ত তাকেও আরও মার্জিত, আরও পালিশ–সহনশীল, আরও আপাতদৃষ্টিসুখকর পরিচ্ছদ ধারণ করতে হবে। মুখে হয়ত আরো একটু মিষ্টি, বিভ্রান্তিকর হাসির প্রলেপ মাখা থাকবে তার। তবু তো সে হবে সেই আদিম বর্বরতারই উত্তরাধিকারী–নয় কি?

মানুষের বা জাতির উপর মানুষের বা জাতির জোর করে কর্তৃত্ব করা এবং সে-কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করাকে বর্বরতা বললে যদি তুমি ব্যথা পাও, তাহলে তোমাদের কাছে ও-বস্তুটিকে বর্বরতা না বলে সভ্যতাই না হয় বলবো।

ফিউডালিজমের এই দুর্দান্ত শিশুটি পৃথিবীর নানা দেশে নব নব রূপে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। কোনো মানুষের শুক্র যেমন বংশ-পরম্পরায় তার একটা নির্ভেজাল ধারা (অবশ্য তার ক্ষেত্র যদি অবিশ্বাসী না হয়, তবেই এই সঙ্কর হওয়ার ভয় থেকে সে মুক্ত থাকে) সৃষ্টি করে যাচ্ছে,–(এক অর্থে একই জিনিস, একই seed ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে উপ্ত হয়ে প্রাণবান হয়ে উঠছে তো)–রাজ্য-সাম্রাজ্যতন্ত্রের দুষ্ট শিশুটিও তেমনি এক সমধারায় কোন্ আদি যুগ থেকে নব নব ক্ষেত্রে জন্মলাভ করে বর্তমানের রূপ পেয়েছে। একটু ভদ্র রূপ পেয়েছে, কিন্তু দুষ্টুমি তার একটুও কমে নি। একটুখানি বুদ্ধি বেড়েছে উপযুক্ত স্থান-বিশেষে সে-বুদ্ধি প্রয়োগ করার অনেকটা পাকামো গজিয়েছে এই যা।

হিন্দু পুরাণ পড়া থাকলে জানতে পারতে, রক্তবীজ দানব এক এক ফোঁটা রক্ত থেকে কেমন গজিয়ে উঠেছিল। একে মেরে শেষ করা যাচ্ছিল না। যত মারা হচ্ছিল, তার থেকে অনেক অধিক সংখ্যায় গজিয়ে উঠছিল। আমাদের আলোচ্য শিশুটি সেই দানবীয়তার কাছ থেকে বীজাণুবহুল অমরতা পেয়ে এসেছে।

আর এ যুগের–বাহ্যত এটা দৈত্যদানার যুগ নয়–সামুদ্রিক জীব অক্টোপাশের কাছ থেকে পেয়েছে জড়াবার বিপুল শক্তির ইঙ্গিত। এরই বীজবহুল রক্তবিন্দুকে সম্বল করে নিয়ে ইংরাজরা সূর্য অস্ত যায় না এতবড় বিশাল আত্ম-বিস্মৃতি লাভ করেছে। এরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তেজনায় পাগল হয়ে এককালে সেরা সেনরা দেশের পর দেশ রক্তে প্লাবিত করেছিল। ভারতের পৌরাণিক যুগের রাজাদের থেকে শুরু করে আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস খাঁ, তইমুরলঙ, ইব্রাহীম লোদী, সুলতান মাহমুদ রক্তস্রোতে রাজপথের পর রাজপথ ভাসিয়ে দিয়েছে, নেপোলিয়ন সৈন্যসেনা নিয়ে এরই তাড়নায় প্রবৃত্তিমার্গে ছোটাছুটি করেছে। মুসোলিনীর আবিসিনীয়া–বিজয় বা হিটলারের সাম্প্রতিক ইউরোপে আত্মবিস্তৃতি তো তারই 'ইন্টারপ্রিটেশন।'

আরো মজার ব্যাপার এই যে, প্রভূত আত্মদানের বিনিময়ে যে-আমেরিকা বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল, সুদূরপ্রাচ্যে vested interest-এর বজ্রবাহু জড়িয়েছিল, সেই ভুক্তভোগী আমেরিকা সেই একই আদর্শের প্রেরণায়, সেই একই আদর্শের তল্পিধারত্ব শক্তভাবে কায়েম রাখার জন্যই বৃটেন বলতে পেরেছে–বর্তমান যুদ্ধের (এটা নাকি জন-যুদ্ধ) উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল জাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। জার্মানী যেসকল জাতিকে শৃঙখলাবদ্ধ করেছে তাদেরকে মুক্ত করাই কিন্তু প্রয়োজন, ভারতকে মুক্ত করে দেবার প্রয়োজন নেই। ভারত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চেয়েছে, জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুঝবার স্বাধীনতা চেয়েছে–কিন্তু সে-চাওয়ার জবাব দেওয়া হচ্ছে নির্মম ভাবে–এও সেই একই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবাদিতার পরিচয় নয় কি?

সাম্রাজ্যবাদ, নাৎসীবাদ প্রভৃতি এক একটা বিরাট অর্গেনিজেশন জন-শোষণের যা কাজ করছে; তাদের যে অগণ্য সন্ততিসকলে দেশ ছেয়ে আছে, জন-শোষণের ক্ষেত্রে তারাও কম কাজ করছে না। পুঁজিদার, ব্যবসায়ী, কল-মালিক, ভূম্যধিকারী, কৃষক-খাটানে জমি-মালিক–মানুষের শ্রম, সম্পদ ও সুখশান্তি অপহরণে তারা কেউই কম পটু নয়। এরা প্রত্যেকেই বৃহত্তর vested interest-এর অসংখ্য খুঁটি। একে মাথায় করে উঁচু করে তুলে ধরে রেখেছে এরাই। তাদের কাঁধে পা রেখেই-না সে সগর্বে নিজের জয় গাইছে। এদের স্বগোত্রীয় কার্যকলাপের ফলে যারা অত্যাচারিত, নিগৃহীত ও হৃতসর্বস্ব হয়েছে, তাদের দিকে দৃক্‌পাত করে অনেক জননেতা ঐ বৃহত্তর কায়েমী স্বার্থের হাতে বেদম মার খেয়েছে। খেয়ে, কেউ কেউ প্রতিনিবৃত্ত হয়ে গেছে। কেউ কেউ হয়নি। হয়নি যারা, তারাও এ পর্যন্ত এমন কোনো সঠিক কার্যপদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেনি, যার দ্বারা সেই সর্বগ্রাসী অজগর মরে গিয়ে লাখ লাখ প্রাণীকে বাঁচাবে, তার মর্মান্তিক আলিঙ্গন থেকে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীর অর্ধাধিক মানুষ সুস্থ হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে।

প্রকৃত মানবতাধ্বংসী এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনতনয়কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক একদল অভিযাত্রী যুগে-যুগে দুর্গম দুঃসাধ্য অভিযানে বেরিয়েছে। কেউ কেউ প্রাণ দিয়েছে, কেউ কেউ এর কাছ পর্যন্ত পৌঁছবার পূর্বেই উষ্ণতা হারিয়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়েছে; কারাওবা এর বিরাট বপুর এককোণে আপন সত্তাকে আবিষ্কার করে অধোবদন হয়েছে এবং এর কাঁধেই গিয়ে কাঁধ মিলিয়েছে। এর সাথে সংগ্রামে কেউ এঁটে উঠতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর কারণ,–এরা দুর্দান্ত ও দুঃসাহসী ঠিক, কিন্তু দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতই দেখা গিয়েছে এদের প্রচেষ্টা। একদমে যতদূর দৌড়তে পেরেছে দৌড়িয়েছে, তারপর স্প্রিং-এর জোর কমে গিয়ে ধরাশায়ী হতে হয়েছে। তাছাড়া প্রতিবেশীর তরফ থেকেও বাধা কম আসেনি।

মোটের উপর এর জড়-শিকড় যে যে স্থান থেকে রস-সঞ্চয় করেছে, নিজে বাঁচবার জন্য, সেই-সেই স্থানে একটা নিঃস্ব আত্মসমর্পণের ভাব জাগিয়ে রেখেছে।–একে সাহায্য করারও এমনি মোহ যে, যে একবার তাকে কিছু দিয়েছে, সবটুকু উজাড় করে দেবার তার একটা প্রবণতা এসে যায় আপনা থেকেই। তেমনি এর শাখাপ্রশাখা যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, তারাও একে কিছু দেবার জন্যে সব সময়ে প্রস্তুত হয়ে থেকেছে।

আবার এর পক্ষপুটে যেয়ে যারা প্রাণ পাচ্ছে, বেড়ে উঠছে, তাদের তো কথাই নেই। তারা আত্মবিপন্নবোধের আশঙ্কায় এর প্রতিকূল সব কিছুকে নাশ করে দেবার জন্য নিঃশেষে আত্মদান করতে প্রস্তুত। কাজেই এর এতখানি কৌলিণ্য ও মর্যাদার নিকট দম-দেওয়া কলের প্রচেষ্টা বার বার প্রতিহত হয়েছে।

এত হাতে সৈন্যের প্রাণ উচ্চমূল্যে বিকোচ্ছে, যন্ত্রশালায় মোটা অঙ্ক ধার করতে এর ভাণ্ডারে যথেষ্ট কাঞ্চন সঞ্চিত আছে। চক্রবৃদ্ধি হারে পরমায়ু বাড়িয়ে নেবার যথেষ্ট সংস্থান এর হাতে মজুত রয়েছে। পক্ষান্তরে এর প্রতিপক্ষের সম্বল শুধু একটা জন-কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা। এর মাইনে দিয়ে সৈন্য পুষবার ক্ষমতা নেই। যা কিছু এর অল্প স্বল্প সৈন্য বিনা মাহিনায় শুধু ত্যাগের প্রেরণায় প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে। এদের পরমায়ু বৃদ্ধির সংস্থান নেই। তাই এরা প্রচেষ্টার মাঝ পথে মরে গিয়ে চুপ মেরে যাচ্ছে। যে গণ-কল্যাণের দায়িত্ববোধ এদেরকে সব সময়ে খুঁচিয়ে উৎপ্রেরিত করে রাখে, সেই জনগণের কাছ থেকেই কিন্তু তারা প্রবল বাধার সম্মুখীন হয় সাধারণত। কতক উৎকোচে, কতক ভয়ে, আবার কতক নূতনত্ব গ্রহণ পরান্মুখ সহজাত প্রবৃত্তির বশে এদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েছে।

যেখানে ভয় বা উৎকোচ কোনো কিছুতেই জনগণকে দমাতে পারেনি–একমাত্র সেই দেশেই আমরা সেই বিরাট শিশুর অপমৃত্যু দেখেছি। কিন্তু সে-দেশকে, 'ছোঁয়াচ'-লাগার ভয়ে তোমরা সর্বক্ষণই অপাংক্তেয় করে রেখেছ। তাকে ঘৃণা কেবল তোমরাই করনি, ঘৃণা করতে অপরকেও শিখিয়েছ। আমরা কিন্তু নিজেদের বাঁধন-খসার আনুকূল্যের আশায় তাকে চিরদিনই সমর্থন করে আসছি। একে সমর্থন করার দায়ে তোমাদের নিকট গালই শুধু খাইনি, তোমাদের প্রাক্তন শত্রুশোণিতধারীদের হাতে মারও অনেক খেয়েছি।

নিজস্ব প্রকৃতির আত্মিক বলটুকু বজায় রেখে তোমরা যেমন তার সাথে মানিয়ে চলতে পারনি, তেমনি প্রসারণ বিশারদ নাৎসীবাদও তার সাথে রফা করে চলাকে নিজেকে অপঘাতমৃত্যুর সামিল মনে করেছে। কাজেই যে যে স্থানে সেই বিরাট শিশুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোণিতবিন্দু পড়েছে–পড়েছে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র–সব দেশই তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করেছে। দুই সমান তেজ ও শক্তিবিশিষ্ট গজ-কচ্ছপ যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো, তখন অঘটন-ঘটন পটু ভগবানের যাদুর প্রভাবে–কিসের সঙ্গে কাকে জুড়ে দেবার তাঁর উৎকট প্রাকৃতিক খেয়ালের বিলাসে, তোমরা সে-দেশকে স্বদলে পেয়ে গেলে এবং তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে জগৎকে তাক লাগিয়ে দিলে। পৃথিবীর অর্ধেক লোকের মনে তখন থেকে একটা অস্পষ্ট আশা জেগেছে–এবং সে-আশা এখনো তাদের মন থেকে মুছে যায়নি।

সে সাধু-আশা এই যে, এবার বুঝি সেই বিরাট শিশুর শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। যারা তোমাদের চির বৈরী ছিল, দুনিয়ায় যারা সাম্যের আলো জ্বালাতে চায়, তাদের কথা বলছি–এবং স্বভাবতই যারা নাৎসীবাদ ফ্যাসিস্টবাদ প্রভৃতি জঘন্য পদার্থেরো বৈরী এবং পাশ্চাত্য শোষণ-বাদের প্রভায় প্রভাবান্বিত আত্ম-বিস্তৃতিশীল জাপানেরো বৈরী–তোমাদের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে যারা অনেক শক্তি ক্ষয় করেছে–এবং সে শক্তিক্ষয় বৃথাই করেছে–এবং যারা তোমাদের বিপদে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসার কথা মনেও ভাবেনি, বরং তোমাদের বিপদে উল্লসিত হবার কথাই ভেবেছে,–তাদেরও জীবনে এলো এক নূতন আশার আলো। তারা সত্য মনপ্রাণ দিয়ে তোমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। তোমাদের শত্রু–কাজেই মানবতার শত্রু– যে শত্রু মানুষকে মানুষের অধিকার দিচ্ছে না, খালি কেড়ে নিচ্ছে, সেই ফাসিস্ট শত্রু–মানুষের কৃষ্টি ও সভ্যতার শত্রুকে চিরদিনের জন্য অচল করে দেবার উদ্দেশ্যে বন্ধুভাবে তোমাদের হাতে হাত মিলিয়েছে।

তাদের যার যতটুকু সাধ্য ছিল, সেটুকু দিয়েই তোমাদের সাহায্য করার জন্য ছুটে এসেছে। তোমাদের পক্ষ মুখে মিঠা-বুলি ঝেড়ে মনে যতই তরুণশীলতার পরিচয় দিক না কেন, এ দল কিন্তু তাদের কাজ হাসিল করে নেবার সঙ্কল্পে অটল। এ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরূপে জিইয়ে রাখার জন্য তোমরা যতই আট-ঘাট বেঁধে চল না কেন, ছিন্ন-তুষারের মতো সব ভেসে যাবার আভাস তারা দেখতে পেয়েছে। তারা এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাবার জন্যে সন্ধানী দৃষ্টি খোলা রেখেছে। কারণ এরা প্রকৃত জনযুদ্ধের মাঝে ফ্যাসিস্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ দুয়েরই মৃত্যুর আভাস দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তাদের চোখে সে স্বপ্নচ্ছবি যতই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, ততই তারা এ যুদ্ধে আমাদের এমন সব বজ্রদৃঢ় শ্লোগান তুলে দৃঢ় আন্তরিকতার সহিত তোমাদের যথেষ্ট সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে।

এখন, এ আন্তরিকতা তোমাদের কাছেও একটা জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, সত্যি সাম্রাজ্যবাদ যাবে নাকি? এ ব্যাপারে তোমাদের একদল চিন্তাশীলের প্রচেষ্টা সত্যি স্মরণীয়। আর তোমরা এরই মধ্যে যুদ্ধের দায়ে কিছু কিছু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ছেড়ে দেবার কথাও ভাবতে শুরু করেছ। যেমন ভারতবর্ষে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থ ত্যাগ করার স্বপ্নও তোমাদের অসহনীয় বোধ হচ্ছে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিচ্ছাকৃত ক্ষুদ্র ত্যাগ অনিচ্ছাকৃত বৃহৎ ত্যাগকে খসিয়ে নিতে পারেই না, তার শেষে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নেই। তাই আমরাও নিরাশ হই না।

তোমাদের মধ্যে যারা প্রকৃত মাথার অধিকারী; তাদের মনে দোলা দিয়েছে, সত্যিই কি এই শিশুর অপমরণ ঘটবে? ঘটবে যদি ঘটুক না। কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রপ্রধান নয় তাই তাদের ভয়েস কার্যক্ষেত্রে এখনো রূপ পাচ্ছে না। কিন্তু তুমি তো জানো গুটিকয় রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিত্বের কালও সীমাবদ্ধ!–জনমনের পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যাদের দিবারাত্রির কল্যাণ চিন্তা রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্রে আজ ভাষা পাচ্ছে না, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাই একদিন যে গণচিত্তের উৎসমুখ দিয়ে–দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে না তা বলতে পার কি?

তাই তোমাদের সাধুসজ্জনদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ঃ একদিন যার মৃত্যু হবেই, আজই কেন তার মৃত্যু হোক না। তাই তোমাদেরও প্রবল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঃ এ আপদ থাকবে কি যাবে!

একে তোমাদের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন বলব কি? চিন্তা জগতে এ আলোড়নে যে-বিপর্যয়ের সলিলোচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে তার ফলাফল কত করাল, কত সুদূরপ্রসারী, এ নিয়ে তোমার একটা বই লেখা উচিত।

যে-শিশুর মৃত্যু-সম্ভাবনায় এরকম সাধু কামনা পোষিত হচ্ছে,–এরা জানে না সে কত বড় চালিয়াৎ, কতখানি সে জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। একে মারতে গেলে তার শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে–তার আওতায় যে-সকল ক্ষুদ্রতর কায়েমী শিশুর দল পুষ্ট হচ্ছে তাদেরও গঙ্গাযাত্রা আশু প্রয়োজন। এসব ছিন্নবিছিন্ন হয়ে গেলে, সে যখন আর কোথাও দাঁড়াবার অবলম্বন পাবে না, শিকড় গভীরে ঢুকিয়ে দিয়েও সঞ্চয়ের জন্য রস পাবে না, এবং বিস্তীর্ণ বিভ্রান্তিকর পত্র-প্রশাখা ছড়িয়ে আহ্বান জানালেও তার তলায় যেদিন আশ্রয় প্রার্থীর ভিড় জমবে না, সেদিন দেহে মনে শুকিয়ে মরা ছাড়া তার আর অন্য উপায় থাকবে না।

তোমরা বিশ্বের সমস্যা নিয়ে খুবই তো মাথা ঘামাচ্ছো, vested interest-এর আওতায় জনগণের ও গণমতের কাহিল অবস্থা দেখে তোমরা, বিশেষত তোমার মত দরদী শিল্পীরা, অনেক অশ্রুইত ঢেলেছ। সর্বহারাদের থেকে কেড়ে খাওয়ার জন্য, তাদের বিপদের সুযোগ নিয়ে তাদের শ্রমকে নিজের কাজে লাগাবার জন্য তাদের সঞ্চয়কে আত্মসাৎ করবার জন্য যে সকল স্বার্থীর দল ওৎ পেতে থাকে, তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সর্বহারাদেরও মনোবল আছে–এ ইঙ্গিতও তো তোমার কথাসৃষ্টির মাঝে সুস্পষ্টভাবেই করেছ।

অতঃপর কি কর্তব্য, তা নিয়েও তো অনেক চিন্তাশক্তি ব্যয় করেছ। এজন্য মানব মনের শ্রদ্ধা তোমার অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু শুধু চীনকে নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। মহাচীনের মতো অনেক দেশই তো মহাস্বার্থের মরণ-কামড়ে ধুঁকছে। তাদের কি জানতে শুনতে নেই? এক মহাচীনকে অমর করে, বাকী তাদের সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলে তো তোমার "মিশন" পূর্ণ হবে না। মহাচীনের স্বাধীন সত্তা আজো সর্বসাকুলো খর্ব হয়নি, তার সম্বন্ধে তার কল্যাণের দিক চেয়ে, ইচ্ছা মাফিক বই লিখেও তুমি বিশ্বদরবারে সম্মানের আসন পেয়েছো। আর যাদের স্বাধীন সত্তা সর্বানুকূল্যে খর্ব হয়ে আছে, তাদের সম্বন্ধে ইচ্ছামাফিক বই লিখে (এ-ইচ্ছা যে সর্বহারাদের স্বার্থের অনুকূল হবে, এবং কাজে কাজেই কায়েমী স্বার্থীদের পুঁজি সংরক্ষণের পথ এতে বিঘ্নসংকুল হতে বাধ্য এ তো জানা কথা) সে–সম্মান তো পাবেই না।

হয়ত এজন্য তোমাকে বিপদের ঝুঁকিও মাথায় নিতে হবে একথা আগেই বলেছ। এই যে পক্ষপাত, এর সমাধান কোথায় ভেবে দেখা তোমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। তোমাদের যাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা আছে, voice আছে, তারা ভাবলেই বিষয়টা জোরালো হবে এবং বিশ্বনিয়ন্তা রাষ্ট্রপ্রধানদের চিন্তাক্ষেত্রে আলোড়ন আসতে সাহায্য করবে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা বই লেখো এ আহ্বান তোমাকে জানাচ্ছি না ভারতের মর্যাদার খাতিরেই। মিস মেয়ো ভারতের একটা দিক দেখে গিয়ে এক বই লিখে বিশ্ব জোড়া খ্যাতি ও কিছু কিছু অখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তোমার চিন্তা সে-ধার দিয়েও যাবে না, তোমার কল্যাণ-বুদ্ধি মানুষের অকল্যাণের প্ররোচনা দিতে পারে না জানি–তবু তুমি মার্কিন, এংলোসেক্‌শন রক্ত তোমার শিরায় বয়ে চলেছে। ভারত যখন বন্যায় ডুবে যাবে, তখন এক জাহাজ মিশনারী এনে ভারতবর্ষ বাঁচাবার ইঙ্গিত যদি তুমি দাও, মহাচীন সেটা কতটুকু প্রাণ দিয়ে মেনে নিয়েছে জানি না–আমরা সেটা মেনে নিতে মনে মনে খুবই ব্যথা পাব। অবশ্য সাগর-পারের সাম্রাজ্যবাদ যাদের মনের গহনে নিহিত, সহজাত সাম্রাজ্যবাদপ্রীতির প্রবৃত্তিকে যারা ললিত করে এসেছে, তারা এতে কি মনে করবে জানি না। তবু চীনের মতো এবস্তু মেনে নিতে আমাদের অন্তরে আঘাত লাগবে, তার কারণ আমাদের সবগুলো মানুষ এখনো তার মতো আফিংখোর হয়ে উঠেনি।

আমি শুধু বলতে চাই, তোমার Good Earth-এরই মালমসলা চরম রূপ নিয়ে এদেশে আহরণের চেষ্টা খুঁজছে। এবং এ-নিয়ে বইটার একটা দ্বিতীয় খণ্ড তুমি লিখলে, তোমার নোবেল প্রাইজের অর্থ প্রত্যার্পণের দাবী ওঠার সম্ভাবনা আছে–এটা যে-যুগ, তাতে এও অসম্ভব নয়।

মিলিটারী মেজাজ বিশ্বের বুকে যে-ক্ষতের সৃষ্টি করে চলেছে, তার জন্য শান্তির প্রলেপ তৈরি করার কাজ সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার নয়; সে-কাজ চিন্তাশীল মননশীল জগতের। এ জগতে যারা বিরাজমান তারা যে-কোনো দেশের যে-কোন শক্তিরই অন্ত র্ভুক্ত হোক না কেন, তাদের চিন্তা ও ভাবধারায় একটি বিশ্বজনীন কল্যাণ প্রচেষ্টা থাকা চাই। তা না থাকলে মনীষা জগতের অর্থই অনর্থসূচক হয়ে পড়ে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসক শক্তিবর্গ যদিও ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ সম্মুখে রেখে যুদ্ধ করেছে, এবং তাদের একের উদ্দেশ্য যদিও নিঃসন্দিগ্ধভাবে অন্যের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী–বিরোধী, কেন না প্রত্যেকেই তারই দেশের সমাজের ও রাষ্ট্রের হিতের দোহাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেড়ে যুদ্ধ করছে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব নীতিকে বলছে সর্বোত্তম এবং তারই সমর্থনে প্রতিপক্ষকে ফেলছে শয়তানের পর্যায়ে। তবু সামরিক জগতের উর্ধে যে-জগত, সূচ-সূতো হাতে নিয়ে জোড়াতালির কাজে উদ্যোগী হয়ে আছে, এবং ক্ষতাদগ্ধ ধরিত্রী করুণ নেত্রে যাদের দিকে চেয়ে আশায় বুক বাঁধছে, তাদের চিন্তা আদর্শ দেশভেদে বিভিন্নরূপী হলে তো চলবে না।

অতীতেও দেখা গিয়েছে, কথাশিল্পী যে কথাচিত্র এঁকেছেন, চিত্রশিল্পী যে ছবি এঁকেছেন–বিশ্বের সর্বজাতির কেবল বুদ্ধিজীবীই নয় একমাত্র, অন্নজীবী মাত্রেই নানাভাবে তাঁর বক্ষে পুষ্টিলাভ করেছে। যে সব চিন্তাবীর মনের দ্বারা খুঁজে ধ্যানের ছবি এঁকেছেন, সমগ্র বিশ্ব তাঁর থেকে গ্রহণ করে মনের প্রসারতা বাড়িয়েছে। দেশবিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা যা দিয়েছেন, জগৎ সমভাবে তা গ্রহণ করেছে। এমন কি, তা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের চিন্তা ও কর্মের স্রোতকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে একই ভাবে সংক্রমিত করেছে। আজ তারা যদি চিন্তার স্রোত কেবল স্বদেশের সংকীর্ণ খাতেই সীমাবদ্ধ করে রাখেন, নিজ জাতির স্বার্থের প্রয়োজনে তারা যদি অন্য কোনো রাষ্ট্র দেশ বা জাতির নববিধানকে অকল্যাণে কলুষিত করে তুলতে প্রয়াস পান তা হলে পরবর্তী বিশ্ববিধানে যে-ফাটল ধরবে তার ফলাফল অনেকদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষকে ভুগতে হবে।

অবশ্য আপাত-আত্মস্বার্থীদের অপেক্ষা তাঁদের দৃষ্টি অধিকতর সুদূর প্রসারী হওয়ার দরুন চিন্তা-নিয়ন্তৃগণ যা বললেন, রাষ্ট্রনিয়ন্তৃগণের নিকট তা সকল সময় প্রীতিপ্রদ নাও হতে পারে। এজন্য অনেক চিন্তাবীরকে রাষ্ট্রধুরন্ধরদের হাতে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে দেখা গিয়েছে। নাৎসী জার্মানীর স্বৈরশাসনতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে সেখানকার দ্রষ্টা ও স্রষ্টাদের নানা প্রকার নির্মম দণ্ডলাভ জুটেছে। এমন কি ডিক্টেটরের স্বেচ্ছাতান্ত্রিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ পুঞ্জিত হয়ে গণচিত্তকে সেই সব নায়কত্বের প্রতিকূলে সচেতন করে তুলতে পারে এই আশঙ্কার সম্ভাবনাটুকু নির্মূল করার জন্য অনেক নিরপরাধ বুদ্ধিশীল মানুষের সেখানে কঠোর দণ্ড জুটেছে তাও আমরা শুনেছি।

এতে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, হিটলারী দণ্ড যত কঠোরই হোক না কেন, মানব কল্যাণকামী দ্রষ্টা ও স্রষ্টারা তার প্রতিবাদ করেন– পৌরাণিক যুগের সেরা সব লাঞ্ছনার ভীতিকে গ্রাহ্য না করে সে-প্রতিবাদ তারা করেন। এবং অনেকের পক্ষে সে-প্রতিবাদ করার সম্ভাবনাও ছিল।

পাশ্চাত্য নাৎসীবাদের এশিয়াটিক দোসর জাপানের বিশ্বচিন্তাজগতে দানের বিষয় কিছুই আমরা জানি না। শুধু জানি ভারতের কবি যেস্থলে সাম্রাজ্যবাদের দানবীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজসম্মান পদদলিত করে থাকেন, জাপানের কবি সে-স্থলে সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল হয়ে মানবধ্বংসী প্রচারকের কাজে আত্মসত্তা বিকিয়ে দেন। এই জাপান। তার পশ্চাতে গৌরবময় অতীত মনীষার ইঙ্গিত না দেখতে পেয়ে তাকে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যহীন বলে মেনে নিতে পারো। তার লোভ ও লালসা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিপক্ষীদের প্রতি তার শাস্তিবিধানের আদর্শ এসব দেখে তাকে, কালচার যাকে পালিশ করে তুলেছে এমন কোন জাতির সমকক্ষ–অন্তত মনীষার দিক থেকে–ভাবতে পার না।

যদিও সে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখিয়ে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। মনে হয়, প্রকৃত দ্রষ্টা ও স্রষ্টার অভাব তার রাষ্ট্র শক্তিকে মনিষী-পীড়নের অপ্রিয় দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে–কারণ যার মাথা নেই তার মাথাব্যথাও থাকতে পারে না। নব্য এশিয়াটিক ভাবী সাম্রাজ্যের পরিকল্পনার প্রচারক বলেই প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও নোগোচিকে প্রকৃত চিন্তানায়কদের দরবারে স্থান দেওয়া যেতে পারে না, কেন না, প্রকৃত চিন্তানায়ক রাষ্ট্রের নিকট আত্মবিক্রয় করতে পারেন না।

চিন্তাজগতে মহাচীনের গৌরবের দানকে কে অস্বীকার করছে? বিশ্বসভ্যতায় ভারত ও মিসরের সুপ্রাচীন অবদানের সঙ্গে তারও দান স্মরণীয়। আত্মাভিমানী প্রতীচ্য এসব দান অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু যে সকল বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে চীন ও ভারত আজও টিকে আছে তাতে করে মেনে নেওয়া যায়, সকল বাধা বিপত্তিতে সোজা হয়ে থাকার মেরুদণ্ড সে তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে পেয়েছে। কিন্তু যারা কোনো বস্তুকে ন্যায়দৃষ্টিতে দেখার সৌজন্য একেবারে হারায়নি, ঐ জিনিসের কদর তাদেরকে অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু এ-সকল কথা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। আমার কথা হচ্ছে–জার্মানীর ন্যায় দ্রষ্টা ও স্রষ্টার সংখ্যাধিক্য যদি জাপানেও থাকত, তা হলে সেখানেও জাপানী স্বৈরাচারের দম্ভকে হয় তাদের মাথা পেতে নিতে হতো, না হয়তো প্রতিবাদ করতে হতো। আর প্রতিবাদ করলে তাদের কপালে অনুরূপ লাঞ্ছনা জুটতো।

তোমাকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে বলছি : রাষ্ট্রকর্ণধারের অত্যাচার সব দেশেই হয়; কোনো দেশে কম কোথাও বেশি, এই যা। কিন্তু যে-দেশে তার জোরালো প্রতিবাদ হয়েছে– সে দেশের আত্মসত্তা মরে যায় নি, মাথা উঁচু করে আছে এ স্বীকার করে নিতে দোষ নেই। এও স্বীকার করে নিতে দোষ নেই, যে দেশে যত অধিক মনীষা-পীড়ন হয়েছে, বুঝতে হবে সে-দেশই আমিত্ব-বলে সর্বাধিক বলীয়ান। কারণ, প্রমাণ হয়ে গেল–মনীষা তথায় ধুলায় না লুটিয়ে শির উঁচিয়েছে।

ঘটনার স্রোত যদি অন্যদিকে প্রবাহিত হতো; তোমাদের মিত্রদের যদি অক্ষ-শক্তির সঙ্গে রফা করে চলতে হতো, তা হলে রাষ্ট্রের রথচক্রে পিষ্ট জনগণের চোখের জলে পিছল হয়ে সেই রথই অচল হওয়ার উপক্রম হতো। তা হলে জনগণের সেই দুর্দিনে দেশের মনীষীরা নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করত এবং তোমরা হয়ত এজন্য তাদের গুরুতর দণ্ডেরই ব্যবস্থা করতে।

কিন্তু যাক সে-কথা, বহু চেষ্টা করার পরেও যুদ্ধ না ঠেকার দরুন জনগণের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্দশা লাঘব ও ব্যক্তিক বন্ধন মোচনের উদ্দেশ্য নিয়ে মিত্ররা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু সীজারের স্ত্রী হলেই তাকে সর্বপাপমুক্ত বলে মেনে নেওয়া যায় না। মিত্রগণের যাবতীয় কার্যকলাপই ভবিষ্যদ্রষ্টা চিন্তানায়ক ও ভাবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বরূপ রচয়িতাদের মনঃপূত ও সমালোচনার অতীত হবে, এমন আশা কেউ করতে পারে না। কিন্তু বার্ণার্ড শ'র দ্ব্যর্থবোধক উক্তি ছাড়া, বিলাতের বা আমেরিকার চিন্তানায়কদের–তাদের দুর্ভিক্ষ দেশে এখনো হয়নি নিশ্চয়ই–ক'জনকে দেখেছ মিত্রদের কোনো কাজের প্রতিবাদ করতে? নাৎসী রাষ্ট্রের মতো এখন তো তাঁদের উৎপীড়িত হবার আশঙ্কা ছিল না।

তবু এক বার্নার্ড শ'র দ্ব্যর্থবোধক মিঠে কড়া বোলচাল এবং কমন্স-এ দুই একজন শ্রমিক নেতার ছাড়াছাড়া দুই একটি অকেজো উক্তি ছাড়া অপর কোনো মনীষীকেই কথাটি বলতে শুনছি না কেন? শেপ অব থিংস টু কাম্-এর গাল্পিক লেখক প্রমুখ দুইচারজন ভাবী বিশ্বের রূপ নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। তাদের সেসব রচনায় নাৎসীভীতি ও তার দূরীকরণের ব্যঞ্জনা যেরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সাম্রাজ্যস্ফীতি ও তাকে নিরাপদ রাখার ব্যঞ্জনাও তেমনি সমভাবে রূপলাভ করেছে। অথচ কে না জানে সাম্রাজ্যবাদীদের অধিকৃত দেশগুলিতে লোকে নাৎসী অভিজ্ঞতা থেকে একেবারে বঞ্চিত নয়। ট্যাংক এরোপ্লেন মর্টারের ঘর্‌ঘর্ দ্রিম্‌দ্রিম্ আওয়াজ আর বারুদাগারের ধোঁয়া তোমাদের চিন্তারাজ্যকে বধির ধোঁয়াটে করে দ্যায় নি তো?

ভারতের কথা আমাদের মুখে তোমাদের কাছে ভাল শোনাবে না তা জানি। আমাদের যারা অভিভাবকত্ব করছে, আমাদের বিষয়ে সকল কথা তোমাদেরকে তারাই নিখুঁত ভাবে বলতে পারবে। অন্তত কতটুকু নিখুঁত করে বললে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, ততটুকু নিখুঁত ভাবে। আমাদের মুখে আমাদের কথা তোমাদের রুচবে না। তাই যদি বলি মার্কিন স্বাধীনতার সেই অমর দশ মহাবাণী সকল মানুষের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য নয় কেন? বাক্যের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার দাবীর জন্য মানুষের আজও নির্যাতন ঘটে কেন? রাম যখন শ্যামের অধীনতা পাশ থেকে রহিমকে মুক্ত করতে যায়, তখন রামেরই অধীনে রঘু কেঁদে বলছে : তুমি আমাকে আগে মুক্ত কর! এই কান্নায় রাম কান দেয় না কেন? আফ্রিকাতে আজ ভারতীয় বাসিন্দাদের এমন অনাদর কেন? জগতের অপর কোনো দেশে তোমাদের শ্বেতাঙ্গদের এমনি অধিকার হরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তোমরা কি করতে! মেনে নিতে পারবে কি এই জঘন্য ব্যবস্থাকে! কোথায় তোমাদের মনীষীদের সুস্থবুদ্ধি!

ব্যাপার দেখে মনে হয় সুস্থ বুদ্ধি কোথায় যেন চাপা পড়ে গেছে–সুস্থ চিন্তার সার্বজনীন স্রোতধারায় শৈবাল এসে পড়েছে। প্রকৃত মনীষা আজ জড়তাপ্রাপ্ত হয়েছে। ভাব ও ধারা নিয়ন্ত্রণের তিনটি প্রবাহ তিনভাবে আজ যুদ্ধেরই কোলে আত্মবিলোপ করে দিয়েছে। জ্ঞান-প্রতিভা নিরেট হয়ে পড়েছে–আর মানুষের বিজ্ঞান-প্রতিভা মারণাস্ত্র নির্মাণের গবেষণাগারে উন্মাদ হয়ে ফিরছে। সাহিত্য সৃজনী প্রতিভা প্রচারপুস্তিকা রচনায় ব্যাপৃত হয়েছে, আর দার্শনিক চিন্তা ও বিচারবোধ চাপ-খাওয়া মাথায় খুলির নিচেই পচে মরছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু মানুষের বিলাস যায় না। মুক্তবুদ্ধি পরিচালনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও, মুক্তবোদ্ধার ভাণ করার অধিকারটুকু ত্যাগ করতে সে রাজি নয়। এজন্যই দেখি, স্বার্থ ও সংস্কারে চিন্তা ও বুদ্ধি যাদের biased, বিশ্বসমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা করেন তাঁরাই। মানে বিশ্বের বর্তমান দুর্দশার লাঘব ও ভাবী মঙ্গল বিধানের জন্য যারা এখনি চেষ্টা করবেন বলে জগৎ আশা করছে এবং চেষ্টা করতেও দেখছে, তাদেরই মন হয়ে পড়েছে পক্ষপাত দুষ্ট। কূটনীতিক চালের আড়ালে শঠনীতির বুদ্ধির খেলাকে ভাবপুষ্ট করে চলেছেন তারাই। কাজেই নববিধান সম্পর্কে তাঁরা যতই ফরমূলা বার করছেন, কারোরই তা মনঃপূত হচ্ছে না এবং সে-সব ফরমূলার একটিও বিশ্বের বর্তমান দুর্গতি লাঘব ও ভাবী মঙ্গলের রূপায়ণ সম্পর্কে কার্যকরী হওয়ার আশা দেখা যাচ্ছে না। এমন কোন পরিকল্পনা দিতে কেউ এগিয়ে আসছে না, যা মানুষের বিক্ষত মনে আশা আনতে পারে আর পাশব যুদ্ধ ব্যবসায় নৃশংস কাড়াকাড়ির জায়গায়–ক্ষান্তি ও শান্তির আভাস জাগাতে পারে।

বর্তমান জগতে সমগ্রভাবে চিন্তার পরিবর্তন আনাই আজিকার দিনের সর্বাগ্রগণ্য কাজ হতে হবে। প্রত্যেকের পরিকল্পনাই যদি নিজের দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের তথাকথিত শ্রীবৃদ্ধির যুক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকে তা হলে বাহিরের জগৎ তাকে গ্রহণ করবে কেন? বাহিরের যে-রাষ্ট্র তাকে গ্রহণের জন্য প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আদিষ্ট হবে, সেও তো তা হলে নিজের অনুকূলে পাল্টা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে চ্যালেঞ্জ জানাবে। আর, প্রত্যেকেরই তা হলে স্ব স্ব আদর্শের প্রতি প্রীতির সংকীর্ণতা উথলে উঠবার প্রেরণা জাগবে–আর এই সংঘাতের দিনে সে প্রীতি প্রতিপক্ষের অপ্রীতিকর না হয়েই পারে না।

আগেই বলেছিঃ যুদ্ধযুগের বৈজ্ঞানিক মন অস্ত্রের কারখানায় বন্দীঃ ধ্যানী, রসিক ও শিল্পী মন প্রচারের ফন্দীফিকিরের ধূর্ত অন্বেষী। এর মধ্যে মুক্তচিন্তাশীল মনের পদমূলে ভূমিস্পর্শ পাওয়ার সুযোগ কোথায়? চিরন্তন ন্যায় ও নীতির দোহাই দিয়ে কেউ কোনো সত্য ও সভ্য শর্ত উপস্থাপিত করলেও স্ব স্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিরোধী বিবেচনায়–যথেষ্ট যুক্তির অবসর না দিয়েই তাকে বাতিল করে দেবার পক্ষপাতী। নিজস্ব ভাবধারার ও স্বার্থের অনুকূলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন মনীষীরা বিশ্ববিধান রচনার আয়োজনে ব্যস্ত।

বলাবাহুল্য এতৎদেশের অস্ত্রঝনঝনার অনুকূলেই তাদের ঐ ভাবঞ্জনার মূর্তি প্রকাশিত হবে। এবং সেই সাংঘাতিক ব্যঞ্জনার মাঝে যে ভাবের সংঘাত ও চিন্তার সংঘাত উন্মুখ হয়ে আছে–রণক্লান্ত বিশ্ব মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র মতই শঙ্কিতচিত্তে তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই গ্রহণের পরিণাম ভাবী বিশ্বের মঙ্গলের কারণ না হয়ে আর একটা মহাসংগ্রাম অদূরবর্তী করারই কারণ হয়ে উঠবে। কাজেই বর্তমান চিন্তারাজ্যের এই জড়তা, সীমাবদ্ধতা ও এক দেশ-দর্শিতা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বিশ্বের সর্বত্র আপাত সহজভাবে গ্রহণের উপযোগী মনে না হলেও উহাকে গ্রহণ করে সমগ্র বিশ্ব সমভাবে উপকৃত হবে। নয়া বিশ্বব্যবস্থায় এরূপ একটি ফ্যাক্টর রচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা সম্ভব কিনা এ তার চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। যুধ্যমান শুম্ভ-নিশুম্ভেরা হয়ত এ খসড়ার প্রতি দাঁতমুখ খিঁচাবেই। কিন্তু তবু একথা স্বীকার্য, ক্লাসিকাল সংগ্রামে রত গজ-কচ্ছপের ক্লান্ত হয়ে পড়ার পর ঐ খসড়াই পৃথিবীর রক্তমৌক্ষিক ক্ষতগুলিতে শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দেবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যারা সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি ও ঐশ্বর্য দেখে তার পাল্টা ব্যবস্থায় জগৎ-শোষণের জন্য নাৎসীবাদ চালাচ্ছে, তাদের দ্বারা যেমন এরূপ কোনো খসড়া রচনার সম্ভাবনা নেই, তেমনি, যারা নিছক সাম্রাজ্যবাদের বিপদ কাটাবার জন্য নাৎসীবাদকে ধ্বংস করতে কোমর বেঁধে লেগেছে তাদের দ্বারাও উহা সম্ভব হবার নয়।

আর আজ যে-সব চিন্তাশীল ব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদের পাল্কী বহন করে, কেউ কেউ আবার বহন না করেই হাঁফিয়ে মরছে, তাদের দ্বারা যেমন এরূপ কোনো উপকারই হচ্ছে না, তেমনি যারা ন্যায় ও নীতি রক্ষিত হবে না আশঙ্কায় চুপ করে আছেন তারাও সেইরূপ কল্যাণ ব্যবস্থার ভীষণ ক্ষতি করছেন।

এর কারণও আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যে-যুগে যে যে মনীষী চিন্তাজগতে আবির্ভূত হয়ে সত্যের সন্ধান দিয়ে গেছেন, তাঁরা তা না দিয়ে নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে থাকলে সে-যুগ সমৃদ্ধ হতে পারত না বলে, তাঁরা যুগের মানুষের ক্ষতির কারণ হতেন। যুগের দায়িত্ব পালন না করার দরুন তারা ন্যায় ও নীতির নিকট অভিযুক্ত হতেন।

ভাবী বিশ্বে মানুষ পরাধীন থাকবে না, এবং মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতির অবসান হবে এমনি ধরনের কথা মাঝে মাঝে মিত্রপক্ষীয় সুধীদের মুখ থেকে শোনা যায়। এখানে ভাবী বিশ্ব মানে সুদীর্ঘকাল পরের ভাবী বিশ্ব নয়—বর্তমান যুদ্ধটা কোনোরকমে জয় শেষ হয়ে গেলেই তাদের ঐ কল্পিত নয়া ব্যবস্থা-মতো কাজ হয়ে গেল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা বিশ্ব বলতে ইউরোপ আর আমেরিকাকেই বোঝে। আর সমস্যা বলতে ঐ দুই মহাদেশের সমস্যাকেই সমাধানযোগ্য বলে মনে করে। বর্তমান যুদ্ধে সাময়িকভাবে ইউরোপে কতকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্র (শ্বেতজাতির রাষ্ট্র) পরাধীন হয়ে পড়লেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বর্তমান দুনিয়ার চিরস্থায়ী ভাবে কোনো শ্বেতজাতির রাষ্ট্র অপর কোনো শ্বেতজাতির পদানত নহে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যতগুলি রাষ্ট্র এখন পরাধীন আছে, তাদের সবগুলিই অশ্বেত জাতির। আর, যারা পরাধীন করে রেখেছে তাদের অনেকে শ্বেত জাতি। হিন্দুর ব্রাহ্মণের মতই তারা সমস্যা, সুখ সুবিধা সব কিছুর গুরুত্ব, কেবল নিজের পক্ষ থেকে দেখছেন এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কারণ কি থাকতে পারে! তাদের অধিকাংশ জমিদারী প্রাচ্যদেশগুলিতেই বিস্তৃত। কাজেই প্রাচ্যের সমস্যা যে আলাদা কিছু, তাদেরও যে পৃথক একটা সত্তা থাকতে পারে তা তারা কার্যত স্বীকার করতে চান না। এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে প্রায়ই তারা নীরব থাকেন। আর যদিই বা কিছু বলেন, তাতে সাম্রাজ্যিক-স্বার্থ রক্ষার ভাব এত প্রকট হয়ে উঠে যে, তারা নিজেরাই লজ্জিত হয়ে আলোচনার ইতি করে দেন। বাড়তে দেন না—না দেবার মালিকও তারাই কি না! তাদের দুই একজন যদিও বা নূতনত্ব দেবার জন্য উচিত কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে ফেলেন, অমনি চারদিক থেকে তারা পাগল পাগল বলে রব তুলে তাদের নিরস্ত করে দেন।

তারা মনে প্রাণে জানেন প্রাচ্যের আবার সমস্যা কি? প্রাচ্যের তাদের অধিকারগুলিকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখা দরকার। কিন্তু তা ঐ অধিকারগুলোর নিজের খাতিরে নয়, তাদেরকে অধিকারভুক্ত রাখারই খাতিরে। মানবতার বিপন্ন অবস্থা দেখে তারা বিচলিত; আর হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ মানবতা। এই মানবতাকে রক্ষা ও পুষ্ট করার জন্য তাঁরা স্ব স্ব অধিকারগুলিকে নিয়ে স্বাধীন থাকতে চায়–"আমরা আমাদের ডমিনিয়নগুলোকে নিয়ে স্বাধীন থাকতে চাই।" মিঃ চার্চিলের এই কথায় কী বোঝায়? বোঝায় ঃ "আমাদের ওদের উপর এসে যেন কেউ ভাগ বসাতে না পারে। এদের উপর অধিকারের কাজে আমারা যেন স্বাধীন থাকতে পারি।"

এই যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক লুঠতরাজ এবং কতকগুলি দেশকে আন্তর্জাতিক লুটের মাল বললে হয়ত বিজ্ঞ রাষ্ট্র-প্রধানরা খুশী হবেন না। কিন্তু গতযুদ্ধ অবেলায় ভেঙে যাওয়ার ফলে, তখন শান্তির অর্থ স্থিরীকৃত না হওয়ার দরুন আন্তর্জাতিক শান্তিমন্দির লীগ-অব-ন্যাশনস যে ভাবে খেয়াল খুশী মতো ব্যবহৃত হয়ে পণ্ডদশা প্রাপ্ত হয়েছিল,–বর্তমান যুদ্ধের সময়েও মানবতা অর্থে বিশ্বের সমগ্র মানবতা না বোঝালে এবং সাম্রাজ্যিক স্বার্থের হাত শুধু সংযত নয় একেবারে ভঙ্গ না হলে মানবতার যাবতীয় ফাঁকা বুলি মিথ্যায় পর্যবসিত হতে বাধ্য হবে।

গত যুদ্ধের শান্তির ফাঁক এবার যেরূপ ফাঁকি হয়ে দেখা দিয়েছে, অদূরবর্তীকালে এসব ফাঁকা বুলিও তেমনই কদর্যভাবে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হবে। এংলোসেক্শন জাতি যদি একাই সগর্বে দুনিয়ার বুক মাড়িয়ে মার্চ করে চলতে চলতে লক্ষ্যস্থলে পৌছায়, তা হলে যুদ্ধ জয় হয়ত হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের বহুঘোষিত সদুদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করা সম্ভব নাও হতে পারে।

পক্ষান্তরে জাপ সাম্রাজ্যবাদ প্রাচ্যে তার জাপানী নয়া-বিধান প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে, সে-স্বপ্ন নতুন কিছু উদ্ভাবিত বস্তু নয়। আন্তর্জাতিক লুটের মালগুলির মাঝে চীন অন্যতম। জাপ-আক্রমণের বহু পরে আমেরিকান মনীষীদের মনে একটা সুমতি এসেছিল এবং তাতে তারা স্বীকার করেছিলেন যে, চীনের উপর থেকে ঈঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যিক স্বার্থের হস্ত কিছুটা সঙ্কুচিত করা প্রয়োজন। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের মতই এই মৃদু আন্দোলন বড় কার্যের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র কার্যের রূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং প্রয়োজন শেষে আবার তা মিলিয়ে যেতেও দেরি হয় না।

কোন উৎসমুখ থেকে জাপান তার আদর্শের ফোয়ারা আবিষ্কার করেছে তার বিচার না করেও আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে তার থেকেও বিশ্বের বিপন্ন হবার সম্ভাবনা কম কিছু নয়। গত যুগের অমীমাংসিতভাবে গৃহীত নীতির রক্তকণিকা থেকেই এই রক্তবীজের উদ্ভব। কাজেই অন্যান্য স্বার্থের ন্যায় এ স্বার্থেরও উদ্ভব অনিবার্য। মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখা ভালো যে, এ সবার অভ্যুদয় দিনেকের ব্যাপার নয়। বহুদিবসের প্রস্তুতির রূপ নিয়েই এরা অভ্যুদিত হয়–যেরূপ হয়েছে হিটলারের শক্তি, যেমনটি হয়েছে জাপশক্তি–যে রকমটি হয়ে আছে বহুশতাব্দীর শোণিতলেহী পরিপুষ্ট ও পরিমার্জিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয়।

ভাবী বিশ্ব যদি হিটলারের মতানুযায়ী ব্যবস্থিত হয়, তা হলে মানবতা একদম লোপ পাবে–মিত্রপক্ষের এ শ্লোগানের প্রচারে প্রচারকৌশল অনেকখানি আছে এ মেনে নিলেও ফ্যাসিস্তবাদের প্রকৃতির সহিত যাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তারা এর সততায় মোটেই সন্দেহ প্রকাশ করবে না। জাপ-আদর্শে বিশ্বব্যবস্থিত হতে পারে না; তার দৃষ্টি অতটা সুদূর প্রসারী নয়। এশিয়াকে নবব্যবস্থায় লীলায়িত করার তার সংকল্প–তার নিখিল এশিয়াকে শ্বেতাঙ্গ শোষণ থেকে স্বাধীন করার শ্লোগানের অর্থ আজ যারা শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে তাদের শোষণ করার দায়িত্বটিকে নিজের হাতে তুলে নেওয়া ছাড়া অপর কিছু হতে পারে–এ যারা ভাববে–তারা ভুল করবে।

কিন্তু আত্মিক বলে বলীয়ান এশিয়ার ন্যায় একটি মর্যাদাসম্পন্ন গোটা মহাদেশ প্রাচ্যের ধার করা আত্মবিস্তৃতিবাদদুষ্ট একটা রাষ্ট্রের পাশব শক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে না। ভাব-লোকে আত্মপ্রসারের ইঙ্গিত প্রাচ্যের ঐশীবাণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আত্মপ্রসারের বস্তুতান্ত্রিক দিকটা পাশ্চাত্য থেকেই ধার করা বস্তু। তার এ ব্যবস্থা মেনে নিয়ে এশিয়া তার আত্মিক মরণ ডেকে আনতে পারে না। (তার আত্মিক সত্তার নিন্দা বা প্রশংসা কোনটাই আমরা করছি না–এটুকু মনে রাখতে হবে।)

বাকি রইল ভাবীবিশ্ববিধানে আদর্শের প্রভাব বিস্তারের কথা। কথাটা একটু শক্ত হলেও সত্য যে, তাদের কোনো সুস্পষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন নীতি এ যুগের সুদীর্ঘ ব্যাপ্তি জুড়েও কোথাও চোখে পড়েনি। আদর্শের সাথে খাপ খাইয়ে যুদ্ধকে তারা বিবর্তিত করছেন, এ কথা সত্যাশ্রয়ী কোনো ব্যক্তির মুখ দিয়ে বেরুতে পারে না। যে-মানবতার জন্য তারা লড়ছেন, তা কোন মানবতা? কবির বন্দিত–'বিশ্ব জুড়িয়া এক জাতি আছে সে-জাতির নাম মানব জাতি' গণসমাজের এ মনাবতা কি? তা যদি হতো–তা হলে অনেক জটিল বিষয় সহজ হয়ে পড়ত।

যুদ্ধের অবস্থা শনৈঃ শনৈঃ আশাপ্রদ হয়ে যাচ্ছে। মানবতামুক্তির আশা একটু একটু করে আলোকশিখা দেখাচ্ছে। অন্তত সুধীসমাজকে আনন্দ দিতে পারে এমন পরিস্থিতি যুদ্ধের চাপে দেখা যাচ্ছে। তা হচ্ছে জাপান-জার্মানীর বিরুদ্ধে বিরাট এক সংঘবদ্ধতা। এ কিন্তু, যুদ্ধাস্ত্রের ঘন সন্নিবেশ নয়–যে মস্তিস্ক যুদ্ধাস্ত্রের চালকদেরও চালক, এ হচ্ছে তারই ঘন সংবদ্ধতা, এ শুধু বহুরাষ্ট্রের সংঘবদ্ধতা নয়–বহু কর্মীর গুষ্ঠি গঠনও। ফলে এযুদ্ধ এমন এক দুরূহ পথে বিপতিত হতে চলেছে যে, অনেকেই একে গণযুদ্ধে রূপ নেবারই আশার আলোক দেখছেন।

রাশিয়ার যোগদান আচমকা ও আকস্মিক হলেও এর ফল সুদূর প্রসারী হতে বাধা নেই। মজার ব্যাপার এই যে, দুটি যুযুধান সম আদর্শের পালোয়ানের এক পক্ষ নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার এক বড় অংশ সেই অবলম্বিত পক্ষকে নিজের pious water খাইয়ে পুষ্টও করছে। আহার জীর্ণও করছে, আরেক পক্ষকে ঘা মারার জন্য। এতে অন্য পক্ষ বল পাচ্ছে, কিন্তু তার খোলস বদলানোর সকল অনিচ্ছাকে আড়াল করে তার আপন স্বরূপ ফিকে হয়ে যাচ্ছে এবং তার নেড়া শাখায় সবুজ আভা দেখা যাচ্ছে।

ঐ আভা যারা দেখছেন, এ ডামাডোলের বাজারে তারা কিন্তু বসে নেই, ওরা একদল দুঃসাহসী যাত্রী। যাবতীয় জনপ্রিয় ব্যবস্থা থেকে ওরা আলাদা। কায়েমী ব্যবস্থার আফিমী নেশায় দুনিয়ার লোক মশ্‌গুল। পায়ের তলার গভীর ফাঁকে দেখছে না এ খাল কেটে চলেছে তারাই, যারা ঐ বিরাট শিশুর রক্তে বলীয়ান। ছিন্নমূল ডাল পাতার সবুজ ফাঁকা আস্তরণ সে-ফাঁককে রমণীয় করে রেখেছে। মানুষ মরছে সেই ফাঁকে পা দিয়ে দিয়ে। মরবার আগে শান্ত্বনা নিচ্ছে হোক না সে ফাঁকি–কিন্তু তার পুরোভাগে তো ছিল সবুজেরি স্বপ্ন–ওরা মানুষের পায়ের তলায় সে-ফাঁক দেখিয়ে দিচ্ছে বলে মানুষ এদের উপর খাপ্‌পা। আফিম দেওয়ার রাষ্ট্রগুলি আর আফিম-খাওয়া মানুষগুলির ঐকান্তিক ঘৃণা ও বিরোধিতার কর্দমকণ্টকে দুর্গম পথ দিয়ে এদের যাত্রা, তাই বলেই না এরা দুর্গমের যাত্রী?

কিন্তু এদের ছোঁয়াও বড় শক্ত, বড় তল প্রসারী। এ ছোঁয়াও মানুষের রাষ্ট্র যতই বাঁচিয়ে চলতে চাইছে, এর প্রভাব ততই মনের গভীরে শিকড় মেলে দিচ্ছে। এর ভিতরে যারা বিভীষিকা দেখেছেন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য বুদ্ধির শায়িত হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে অগৌরবের নয়। তাই দেখা যাচ্ছে, তাঁদের উদ্দেশ্য আগাগোড়া মানবতার রক্ষা হলেও সমব্যবসায়ীদের প্রতি সহানুভূতিতে তারা কৃপণ নয়।

এক রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ আরেক রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদকে পুষ্ট রাখার জন্য যথেষ্ট করেছে তারা–এর নজীরের অভাব নেই। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল কি কেবল আর্থিক সম্পদে কিংবা বৈষয়িক ব্যাপারে লাভবান হওয়ায়? না, তা ছাড়া আরো কিছু এর পেছনে আছে? সাম্রাজ্যবাদকে একটা বিরাট ব্যবসায় বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই ব্যবসায়ের স্বার্থের খাতিরে অনেক রাঙ্‌কে সোনা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা অনেকবারইতো দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ছিন্ন হলে এ বেনিয়া-বৃত্তিকে চালু রাখা যায় না। তাই এ বেনিয়া বৃত্তিকে তারা আন্তর্জাতিক করে তুলেছেন আত্মপুষ্টির খাতিরে এবং আবিসিনিয়ার যুদ্ধে যারা আক্রমণকারী ইতালীকে অস্ত্র যুগিয়েছেন এবং এই সেদিনও যারা চীনের বুকে জাপ হানাকে সমর্থন করেছেন (নোগোচির প্রতি রবীন্দ্রনাথের উত্তরাঘাত স্মরণীয়। এবং পরাধীন ভারতের আত্মিক মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার সাথে তাদের স্বাধীন মনের অসত্যশৃঙ্খলিত অমুক্ত ভাবধারার তুলনা কেউ করবে কি?)–এ তারা করেছেন কি কেবল ব্যবসায়ের খাতিরে?

দেশবিদেশের কায়েমী রক্তে জড়ত্ব বিধ্বংসী বীজের অনুপ্রবেশের প্রতিবাদের খাতিরে এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী রাখার চেষ্টা কি এর মধ্যে নগ্ন হয়ে উঠেনি? এ সমস্ত গলদ নিয়েও তারা বিজয় গর্বে রথ চালিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়ার জোর আগের মত যে পাচ্ছে না, তার প্রমাণ এই যে তাদের শ্লোগানের ধারা আগের থেকে অনেক বদলে যাচ্ছে। এ পরিবর্তনকে খালি প্রচার-কৌশল বলে ভুল করে এর থেকে কান ফিরিয়ে নিলেই আমরা লাভবান হবো তা মেনে নেওয়া চলে না। এর যতটুকু আমাদের অনুকূলে সে-টুকু গ্রহণ করে, প্রতিকূলটুকুকেও অনুকূল করে নিয়ে ধীরে ধীরে বিশ্বে নবব্যবস্থার ডালপালা বিস্তার করাই এরা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মেনে নিয়েছে।

তাই আগে যারা গ্রাহ্যের বিষয় ছিল না, কিন্তু এখন একটা নূতন সমস্যা এরা বয়ে নিয়ে এসেছে। এখন এই sweet devil গুলোকে ছাড়িয়ে নিয়ে পথ চলা একেবারেই মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৃদ্ধ তার তরুণী ভার্যা সম্পর্কে তার তরুণ শত্রুকে নিয়ে যে-সমস্যায় পড়ে, এই "মিষ্টি শয়তান" গুলিকে নিয়ে এই বৃদ্ধ এঞ্জেলের দল ঠিক সেই সমস্যায় পড়ে গেছে। এর কারণ, নানা দেশের অলিগলিতে বৃহত্তর vested interest-এর যে-সকল খুঁটী রয়েছে (এ সকল খুঁটি তার উপজীব্য ও উপকরণ–তাদের উপজীব্য আবার সর্বহারা শ্রেণির জনসাধারণ) তাদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা গণ-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবেই। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে বৃহত্তম vested interest-এর আশু বিপদ দেখা না গেলেও তার অণুশিকড়গুলিতে ঘূণ ধরার আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়।

এখন কথা হচ্ছে যাদের এখন ছাড়ানো যাচ্ছে না, নূতন বিশ্বব্যবস্থা রচনা কালে এই sweet devil-দেরকে তাতে কতটুকু voice দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক কোমিন্টার্ন গিয়েছে, কাজেই তাদের আন্তর্জাতিকভাবে দলবদ্ধ থাকবার সুযোগ ফুরিয়েছে। এই অবস্থায় ঐকদেশিক স্বার্থের ধমক তাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিকে যদি অস্পষ্ট করে না ফেলতে পারে, তা হলে ভাবী বিশ্বে তাদের স্থান নগণ্য জায়গায় নাও হতে পারে।

প্রধানত জগতের তিনটি দেশই চিন্তা জগতে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। স্পেন, চীন ও রাশিয়ার কথা বলছি। ভারতবর্ষের কথা ইচ্ছা করেই বাদ দিলাম। কারণ, সেই অপকৃষ্ট শ্রেণির স্বার্থ বোধ হাবসী সম্রাটের করুণ কান্নায় ও আমিষগন্ধী নিরপেক্ষতা নীতি ছেড়ে দেয়নি। সেই বোধ প্রবণ তাই মেনে নিয়েছে যে ভারত হচ্ছে বৃটেনের ঘরের জিনিস। তার সমস্যা হচ্ছে বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপার। একে বিশ্বসমস্যার দরবারে ডেকে আনা চলে না। একে নিয়ে যা করবার বৃটেনই করবে। নবব্যবস্থার ধারকদের, মানব মুক্তির পথপ্রদর্শকদের, দুর্বৃত্তের কবল থেকে পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনে দেবার জন্য আত্মনিবেদিত 'হিরো' দের ভারতকে নিয়ে কিছুই করবার নেই!

বলছিলাম, ঐ তিনটি দেশেই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা বিপন্ন হবার উপক্রম হওয়ার নজীর নানা ক্ষেত্রে রয়েছে। স্পেনের গণতন্ত্র ভেঙে দিয়ে সেখানে ডিক্টেটারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রাশিয়ার সাম্যবাদী গণতন্ত্র ভেঙে দিয়ে সেখানে হিটলারী ভাবধারা প্রবেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য মরণপণ চেষ্টা করেছে। চীনে একদিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অন্যদিকে জাপ আক্রমণ তার দেহ ও মন দুটিকেই ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। এই তিন দেশ সম্পর্কেই আধুনিক যুগের ব্যবসায়ী গণতন্ত্রীদের অতীতের ব্যবহার ভালো নয়। এ ব্যবহারের দরুণ তারা যে বিশ্বাস হারিয়েছিল, আজ পরিবর্তিত ব্যবহারের দ্বারা সে বিশ্বাস অর্জনের পথে যেমন পা বাড়িয়েছে, তেমনি এক চোরাবালিতে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কায় শিহরিত হয়ে উঠেছে। কারণ প্রকাশ্যে নিরপেক্ষতার মুখোস নিয়ে পরোক্ষে উস্কানী দেবার যে নীতি তারা একদা গ্রহণ করেছিলেন তার ফলে তাদের বিরুদ্ধে সর্বত্রই অল্পবিস্তর একটা নূতন মননের সৃষ্টি হয়েছিল। তার সবচেয়ে বেশি প্রকাশ হয়েছিল ভারতবর্ষে। তার নিজের পরাধীনতার মর্মঘাতী জ্বালা মনে করেই রাশিয়ার মানববুদ্ধির আদর্শকে স্পেনের ইঙ্গমার্কিন অথর্বতাকে এবং চীনের জাপ বর্বরতার আস্ফালনকে এত অধিকবার নিন্দা অসমর্থন করেছে এবং ইঙ্গমার্কিন নৈতিক বলকে সে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার তাগিদ দিয়েছে। শুধু তাই নয়। এসব দেশের দুঃখে তাদের বুক কান্নায় ভেঙে আসছিল বলেও নয়। তাদের এ ব্যাপারের অন্তরালে আরো একটা ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট বর্বরতা ও সাম্রাজ্যবাদী ভণ্ডামী দুইয়েরই প্রতিকূলে একটা বিশ্বনৈতিক ও বিশ্বজনীন প্রতিবাদ খাড়া করে তোলা।

দেখা যাচ্ছে, ভারত নানা দেশের যত সব অত্যাচারিতের দুঃখ দুর্দশা ও সমস্যাকে নিজের বুকের মাঝেই অনুভব করে, ঐ সব দেশের লক্ষ্য কিন্তু ততটা ভারতের দিকে নেই। তাই রাশিয়া সম্বন্ধে ভারতে রাশি রাশি হিটলারবিরোধী পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও, ভারতে বৃটিশ নীতির বিরুদ্ধে সেখানে টু শব্দটিও নেই। শেষ পর্যন্ত অনূদিত হতে চলেছে সেখানে মহাভারতের একটা রুশ কাব্যানুবাদ! স্পেনের জাতীয় স্বাধীনতা অপহৃত। তার কথা ওঠে না। স্বাধীন চীনেরও দুটো মৃদু সহানুভূতির বাণী দেওয়া ছাড়া ভারত সম্পর্কে আর কিছু করবার নেই। এর থেকে কি সিদ্ধান্ত টেনে আনা যায় না যে, দুনিয়ায় সাম্যবাদও যথার্থ পথে চলছেনা—স্ব-আদর্শ-বিরোধী যে কোন অন্যায় আচরণের সুদৃঢ় প্রতিবাদ করার শক্তি তারা এখনো আয়ত্ত করতে পারেনি। অর্থাৎ ভাবী বিশ্ববিধান নিজের আদর্শ ও অভিমত প্রতিষ্ঠা করার মতো ক্ষমতা অর্জনের তাদের এখনো অনেক দেরী!

অনেক কথা বলা হোল। কিন্তু শেষ কথাটি বাকি আছে।

আজ মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এইখানে ঃ নিজের অনুকূলে অপরের প্রতি অন্যায়ের অনুষ্ঠানকে প্রতিবাদে নিরস্ত করার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃত আদর্শনিষ্ঠার গলতিকে, আদর্শের নাম দিয়ে একটা পঙ্গুতাকে অস্ত্রের পিছনের শক্তির বলে আদর্শ বলে চালাচ্ছে! এখানে লক্ষ মানুষ স্বেচ্ছায় অনলে ঝাঁপাচ্ছে, লক্ষ মানুষ নিদারুণ অনিচ্ছায়, না খেতে পেয়ে মরছে। আর লক্ষ মানুষ সত্য কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে কচুকাটা হচ্ছে। এসবের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আধুনিক জগৎ মানুষের প্রাণের দাম দেয় না, লক্ষ লক্ষ আর্তজনার প্রতিবাদ মানে না, কোটি কোটি

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী ৫৭
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরন্নের হাহাকারে কর্ণপাত করে না। বুদ্ধির জগৎকে পঙ্গু করে দিয়ে কোটি মানুষের বুকের উপর দিয়ে সে তার আদর্শের রথ চালিয়ে নেবেই।

তোমার মুখে এবং তোমাদের আরো কারো কারো মুখে এর একটা মৃদু প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সে-প্রতিবাদ এত অস্পষ্ট যে, বেশী দূর থেকে ভালো করে শোনাই যায় না। পুঁজিবাদের বিষ আকণ্ঠ পান করে তোমরা নীলকণ্ঠ হয়ে আছ। তাই বিবেকের তাড়নাকে তোমরা মৃত্যুবরণের সাহস নিয়ে অভয় দিতে পারছ না। কতকটা সহায়তা পাচ্ছ না বলেই হয়ত তোমাদের প্রতিবাদ খুব জোর পাচ্ছে না। চীনের তুমি যে-সমস্ত মানুষ অঙ্কন করেছ, তাদের মতো অনেক দেশেই এমন অনেক মানুষ আছে। এ খোঁজও তোমাদের না রাখার কথা নয়। এ সব মানুষের মাঝে অনেক ঠেকে শেখা একটা বিরাট প্রতিবাদের হাঁপর ফোঁপাচ্ছে। বৃহত্তর vested interest-এর ধারক ও বাহক ক্ষুদ্রতর কায়েমী স্বার্থের মানুষগুলিকে এ ফোঁপানি সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। বৃত্তের কয়েকটি স্বার্থকে আপাতত তারা নাগাল পাচ্ছে না–পাওয়ার দরকারও নেই। সর্ব মানবকে স্বাধীন করার বিলাসে ডোমিনিয়ন নিয়ে স্বাধীন হওয়ার নয়া সংকল্প নিয়ে যারা অনির্বাণ সংগ্রাম চালাচ্ছে এবং যাদের আদর্শের স্বার্থে সকল কপট ও ভণ্ড আদর্শের স্বার্থের খাতিরে অমিল হতে বাধ্য–তাদের সাথে তোমরা হাত মেলাতে পার কি? তা যদি পারতে. তা হলে হিটলার ধ্বংস হতো, নাৎসী-ফ্যাসিস্তবাদ পুড়ে মরতো, এমন কি সাম্রাজ্যবাদেরও ভরাডুবি হতো এবং পুঁজিবাদের শিকড় শুদ্ধ টান পড়তো। কিন্তু গোড়াপত্তন হতো মুক্ত মানবতার সুস্থ জীবন ধারার।

পরিশিষ্টের কথাগুলি শোনো;

নববিধানে মানুষের অধিকারটাকেই বড় করে স্থান দিতে চেষ্টা করো। যারা ঐ বিধান রচনা করবে প্রবন্ধ লিখে বা জোরালো বিবৃতি দিয়ে তো নিজের মত প্রতিষ্ঠা করো। তাদের মন ও মতিকে আর জনমতকেও টেনে নিও তোমার মতের অনুকূলে।

আজ পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্রই মানুষের পুরা অধিকার দেয় নি। রাষ্ট্রের রক্ষার খাতিরে তার পাদমূলে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষের বলি হয়েছে। এ আর হতে দিও না।

ভিন্ন মানুষের ভিন্ন অভিমত থাকবেই। নিজের মত নিয়ে তারা দল গঠন করে, মনে করে এই মতে রাষ্ট্র চললে বা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হলে রাষ্ট্রের ও মানুষের মঙ্গল হতে পারে। প্রকৃতি তাকে যে মত পোষণের স্বাধীনতা দিয়েছে তাকে যেন গলা টিপে মারার চেষ্টা না হয়। কারণ কে জানে তারই হাতে ক্ষমতা গেলে, সেও পূর্ববর্তীদের মতকে গলা টিপে মারবে না! এ-ব্যবস্থায় চক্রবৃদ্ধি হারে মানুষের দুঃখ দুর্দশা বেড়ে চলেছে এবং চলবে। কল্যাণাদর্শ স্থাপন অপেক্ষা স্থাপনের উগ্রতাটাই সব সময় বড় হয়ে দেখা দেয় বলে তার ফল হয় বড় নিষ্ঠুর রকমের সাংঘাতিক।

রাষ্ট্রাদর্শ একটা নিত্যকালের মিথ্যা জিনিস। সনাতন সত্যের দরবারে তার স্থান নেই। তাই দেখতে পাই, একসময়ে যাকে উত্তম বলে গ্রহণ করা হয়, অধম হয়ে পরিণত হয় সেটা। অধম বলে গলা টেপা হয় যে-আদর্শের, ক্ষমতা হাতে পেলে সেটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তম হয়ে দাঁড়ায়। আবার আরো উত্তমতা চিরস্থায়ী হয় না। কাজেই এই ভুয়া জিনিসের জন্য পূর্ণবয়স্ক, sensible, সুস্থ দেহ মনের অধিকারী মানুষকে শুধু মতবিরোধের জন্য দৈহিক নির্যাতন প্রদান কসাইগিরি অপেক্ষাও অধম কাজ, এ কথাটা তুমি উত্তমরূপে প্রচার করতে পারো তোমার কোনো বই-এ। মনে রেখো রাষ্ট্রের হাতে নিগৃহীত না হওয়া মানুষের প্রাথমিক অধিকার হওয়া উচিত।

আর দেখো, রাষ্ট্রের নির্মমতার সঙ্গে সংগ্রাম করে করে জগতের অনেক ভালো আদর্শের শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। এই রাষ্ট্র নামক পদার্থটির যদি এত শক্তি না থাকতো, মানুষের কল্যাণকর অনেক ভালো জিনিস তা হলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো। জগতের বর্তমান চেহারা ঠিক বদলে যেতো–একি শুধু pious hope?

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা কথা তিনটি মানুষের জপমালার মতো হয়ে আছে! কিন্তু এই তিনটিকেই পদে পদে অবমানিত করা হয়, এবং এর একটিরও কোনো দাম দেওয়া হয় না, তিনটিকেই নির্মম ভাবে বলি দেওয়া হয় দেবতারূপী দানবের পাদমূলে, কোন্ অভীষ্ট লাভের জন্য? বিশ্লেষণের প্রয়োজন কি আজো আসেনি? এই বস্তুত্রয়কে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করার সৎসাহসে রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার আগ্নেয় প্রয়োজনবোধ কি আজও চিন্তানিয়ন্ত্রণকারীদের লেখনী মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করার গৌরব থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে? –অলমিতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থকার, সমালোচক এবং জনসাধারণকে লক্ষ্য করে এই প্রবন্ধের অবতারণা। থিয়েটার নাট্যাভিনয় কি করে শুরু হয়,–রচনার শুরু থেকে প্রথম রজনীর অভিনয় পর্যন্ত তাকে কি কি রকমারি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, এই প্রবন্ধে তাই বোঝাব। নাটক আমরা বুঝি এ বলে সত্যের অপলাপ আমরা করতে চাই না। সত্যি বলতে কি, থিয়েটার আদতে কেউ বোঝেই না, এমন কি যারা থিয়েটার করে করে হাড় পাকিয়েছে, তারাও না। যে-সব পরিচালক চুলদাড়ি পাকিয়েছেন, তাঁরাও না, এমন কি সমালোচকরা নিজেরাও না। আগে থাকতে নাটক-লেখক যদি জানতেন তাঁর লেখা সার্থক হবে, পরিচালক যদি জানতেন 'হাউস' প্রতিদিন 'ফুল' হবে, আর অভিনেতৃগণ যদি জানতেন নাটককে তাঁরা উৎরে দেবেন,–হায় হায়, নাটক মঞ্চস্থ করা যে তা হলে ছুতোর মিস্ত্রীর আর সাবান তৈরির কাজের মতই সরল হয়ে যেত! তা হবার নয়।

থিয়েটার জিনিসটা যুদ্ধবিগ্রহের মত একটা আর্ট-বিশেষ আবার সাপ-সিঁড়ি খেলার মত জটিল। কি রকম হয়ে এটা আত্মপ্রকাশ করবে, আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। শুধু প্রথম রাত নয় রাতের পর রাত, এ যে হয়ে চলে, সেইটেই আশ্চর্য। শুরু থেকে একে সমাপ্তি অবধি চালিয়ে নেওয়া, সেও এক বিরাট আশ্চর্য। আগে থেকে ছক কেটে নিয়ে সেই ছাঁচে তাকে শেষ করা–থিয়েটারের বেলা এ নিয়ম খাটে না'ক; অসংখ্য অভাবিত বাধাবিপত্তি ক্রমাগত জয় করে তবেই তার রূপায়ণ। সিনারির একটিমাত্র কাঠি, অভিনেতার একটিমাত্র স্নায়ু কোন এক মুহূর্তে বিকল হলেই এ তাসের রাজ্য ধ্বসে যেতে পারে। তবে সাধারণত তা হয় না–কিন্তু হওয়ার ষোল আনা সম্ভাবনা নিয়েও মরিয়া হয়ে তাকে প্রতিদিন চালিয়ে নেওয়া হয়।

নাটকীয় কলা (art) ও তার রহস্য (misteries) নিয়ে কিছু বলতে চাই না, নাট্যশিল্প (creaft) ও তার ঘরোয়া খবরের (secrets) কিছু পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য। রঙ্গমঞ্চ আমাদের কেমন হওয়া উচিত, কিভাবে তাকে আদর্শানুরূপ করা যায়, সে সব বিবেচনা করা খুবই ভাল কথা। কিন্তু আদর্শ নিয়ে কথা বলছেন কি অমনি, এর জটিল বাস্তবের দিকটা ধামাচাপা দিতে হবে। কারণ এর যা ঝামেলা!

বারোয়ারি নাটক বা গঠনমূলক রঙ্গমঞ্চের সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের কিছু বলবার নেই। রঙ্গমঞ্চে সব কিছুই সম্ভব। এ একটা আজব কারখানা। আর সবচেয়ে বড় আশ্চর্য–আদৌ নাটক যে হয়। সাড়ে ছ'টায় যখন পরদা উঠল, ভিতরের খবর জানলে একে স্বাভাবিক বলে ভাবতেই পারবেন না; মনে হবে কোন দৈবের ঘটনা।

নাটকের গোড়াপত্তন

নাটকের গোড়াপত্তন কিন্তু নাট্যশালায় নয় বাইরে–উৎসাহী লেখকের লেখবার টেবিলে। লেখক যখন বুঝবে যে এইবার সম্পূর্ণ হয়েছে,–নাটকের তখনই রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য শীঘ্রই (পাঁচ ছ'মাসের মধ্যেই) দেখা গেল–না ত, এ ত পূর্ণাঙ্গ নয়। ছোট করো, আরো ছোট করো, শেষ অঙ্কটা ছেঁটে ফ্যালো। লেখক নিজে অবাক হয়, আমরাও অবাক হই,–যত দোষ কি ঐ শেষ অঙ্কের? তাকে ছেঁটে কেটে পালটে ফেলতে হবেই–সব ক্ষেত্রে। এর কারণ রহস্যাবৃত। আবার এও কম রহস্যময় নয়– যে সব ক্ষেত্রে নাটক ব্যর্থ হয়, তাও ঐ শেষ অঙ্কেরই জন্য। নাট্য-সমালোচকরাও যত দুর্বলতা, যত পঙ্গুতা খুঁজে বার করে ঐ শেষ অঙ্কে। আমি বুঝি না এসব দেখেশুনেও নাট্যকারেরা নাটকে কেন একটা শেষ অঙ্ক জুড়তে যায়। নাটকে শেষ অঙ্ক বলে একটা কিছু থাকাই উচিত নয়। আর থাকলেও যে উদ্দেশ্যে ডালকুত্তার ল্যাজ কেটে ফেলা হয়, তেমনিভাবে শেষ অঙ্কও কেটে বেমালুম আলগা করে ফেলা উচিত, যেন সারাটা জিনিসকে সে ধ্বংস করে দিতে না পারে। কিংবা আরও এক পথ ধরা যেতে পারেঃ নাটক শেষ অঙ্ক থেকে শুরু করে প্রথম অঙ্কে গিয়ে শেষ করুক–যখন শেষ অঙ্ক এত খারাপ আর প্রথম অঙ্ক এত ভাল। যাই হোক, শেষ অঙ্কের অভিশাপ থেকে লেখককে নিষ্কৃতি দেবার জন্য এমনি কিছু একটা ঘটানো দরকার।

এই ভাবে কেটেকুটে, আবার লিখে আবার কেটে, আবার লিখে, শেষ অঙ্কের পালা শেষ হয়। শেষ অঙ্কের দশা শেষ হলে লেখক উপস্থিত হয় প্রতীক্ষার দশায়। এ এক প্রকার নির্বিকল্প সমাধিক দশা–লিখতে পারে না, পড়তে পারে না–খেতে পারে না, ঘুমুতে পারে না–তার বইটা মঞ্চে যাবে–কি করে যাবে, কি করে হবে, কেমনটি হবে এসব আশা-নৈরাশ্যের ঢেউ এসে তার বুকের তটে তোলপাড় করে। এইরূপ কোন প্রতীক্ষমান নাট্যকারের কাছে যান তো দেখে অবাক হবেন, সে যেন আরেক জগতে পৌঁছে আছে। তার সঙ্গে কথাই বলতে পারবেন না। একেবারে ঝানু নাটকলেখক যাঁরা, এই রকম হৃদয়াবেগ ও অস্থিরতাকে কেবল তাঁরাই কিছুটা চেপে রাখতে পারেন, আর কেউ পারে না। ঝানুরাও অনেক সময় পারে না। জিজ্ঞেস করুন, "কি ভাবছেন?" বলবেন, "ভাবছি? ও হাঁ, এই দাঙ্গাহাঙ্গামার বাজার, চাকরটা সেই সকালে বেরিয়েছিল".... ইত্যাদি। দেখাতে চান যে, নাটকের কথা মোটেই ভাবছেন না।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

মহড়া শুরু করার আগে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পালা। এইখানে নাট্যকার সত্যিকার বিপত্তির সম্মুখীন হন। তিনি হয়ত নাটকে পাঁচজন পুরুষ ও তিনজন মহিলার জায়গা করে রেখেছেন। এই আটজন হবেন নাটকের প্রধান কুশি-লব। থিয়েটারে যত অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছে, তার মধ্যে থেকে আট-নয়জনকে বেছে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়ে নাট্যকার তাঁর নাটক রচনা করেছেন, এই কয়জনা ছাড়া আর কারও কথা, নাটক লেখার সময় তাঁর মনেও ছিল না। পার্ট বন্টনের প্রাক্কালে প্রযোজককে তিনি এই আটজনের কথা জানালেন, প্রযোজক বললেন, "তথাস্তু।"

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল–

ঐ আটজনের মধ্যে–

১. শ্রীমতী 'ক' নায়িকার পার্ট নিতে পারবেন না, কেননা এখন তিনি আরেক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. শ্রীমতী 'খ' বলে পাঠিয়েছেন তাঁর জন্য নাট্যকার যে পার্ট বরাদ্দ করেছেন, সে তাঁর যোগ্য পার্ট হয়নি–
৩. কুমারী 'গ'কে নাট্যকারের খুশিমত পার্ট দেওয়া গেল না, কেননা কুমারী গত সপ্তাহে কোন্ রাজকুমারের কাচে চাকরি নিয়ে চন্দনগড় চলে গেছেন। তাঁর স্থানে কুমারী 'ঘ'কে নিয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই।
৪. শ্রীযুক্ত 'ঙ'কে নায়ক করা চলে না; নায়ক করতে হবে শ্রীযুক্ত 'চ'কে; কারণ, গত বারের 'বাজ পড়ে রে ঘর পোড়ে' নাটকে শ্রীযুক্ত 'চ' নায়কের পার্ট চেয়েছিলেন, তাঁকে বঞ্চিত করে সে পার্ট দেওয়া হয়েছিল শ্রীযুক্ত 'ছ'কে।
৫. তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ শ্রীযুক্ত 'ঙ'কে ৫ম পার্টটি দেওয়া যেতে পারত, দুঃখের বিষয় নাট্যকারের উপর খাপ্পা হয়ে সে পার্ট ফিরিয়ে দিয়েছে। ৪র্থ পার্টটিই ছিল তাঁর যোগ্য ভূমিকা; সেটি তাঁকে কেন দেওয়া হল না, এই তাঁর উষ্মার কারণ।
৬. শ্রীযুক্ত 'জ'কে যা'ই দেওয়া হবে, সে তা-ই নেবে; কারণ, সম্প্রতি খোদ-মালিকের সঙ্গে ঝগড়ার পর সে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে।
৭. শ্রীযুক্ত 'ঝ' ৭নং পার্ট নিতে পারবে না, কেননা যে ৫নং পার্ট ফেরৎ এসেছে, তার জন্য উপযুক্ত লোক আর কেউ না থাকায় তাঁকেই সেটি গ্রহণ করতে হবে।
৮. অষ্টম পার্ট (ডাক-পিয়নের ভূমিকাটি) ঠিক লেখকের খুশিমত লোককেই দেওয়া হবে; আর কাউকে নয়।

কাজেই, দেখতে পাচ্ছেন–অনভিজ্ঞ নাট্যকার যা ভেবে ঠিক করেছিলেন, ব্যাপার হয়ে গেল সম্পূর্ণ অন্যরূপ; শুধু তাই নয়, অভিনেতৃবর্গের পছন্দমত ভূমিকা হয়নি বলে, নাট্যকারকে তাদের বিরক্তিভাজনও হতে হল।

পার্ট দেওয়া-দেয়ি চুকে যাবার পর থিয়েটারের ভেতরে আবার দু'রকম অনুযোগ শোনা গেল–একদল বলছে, নাটকে অত ভাল ভাল পার্ট থাকতে কেন, বেছে বেছে আমাদের দিয়েছে খারাপ পার্টগুলো। অন্য দল বলছে, নাটকের পার্টগুলোও হয়েছে যেমন, এ দিয়ে কিস্‌সু করা যাবে না, ঘাড়ে ঠ্যাং তুলে নাচলেও এর থেকে রসকস কিছু বেরুবে না।

প্রযোজনা

নাটক এবার দেওয়া হল প্রযোজকের হাতে। নাটক হাতে নিয়ে প্রযোজক গোড়াতেই বিজ্ঞতার সঙ্গে, যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বলতে শুরু করলঃ নাটককে দাঁড় করাতে হলে একে সাহায্য করতে হবে, একে নাট্যকার যে ধারণায় খাড়া করেছেন, তার থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে খাড়া করে তুলতে হবে।

শুনে নাট্যকার বললেন, "কি আমার আইডিয়া, তা তো বুঝতেই পারছেন। দুঃখ, বেদনা ও মমতা মিশিয়ে গড়ে তুলেছি নাটকের আখ্যানবস্তু।"

প্রযোজক বললেন, "তা করলে তো মশাই চলবে না। একে পুরোপুরি একটা প্রহসনরূপে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করাতে হবে যে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাট্যকার বোঝাতে চেষ্টা করে, " দেখুন, নায়িকা উমাতারা হচ্ছে এক ভীরু গ্রাম্য বালিকা, তার বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না–"

" মোটেই না, মোটেই না। সে হচ্ছে খৃষ্টানী ঘেঁষা শহুরে মেয়ে। নাটকের ৪৭-এর পাতায় এইখানটাতে দেখুন, দীনেশচন্দ্র তাকে বলছে, আমায় আর কষ্ট দিও না উমা; দীনেশ এখানটায় মেঝেয় গড়িয়ে পড়বে, আর উমাতারা হিস্টিরিয়ার ফিটের মত তার উপর 'স্প্রিং' করে দাঁড়াবে, বোঝেছেন? এই রকম করেছেন ত?"

"আজ্ঞে না। আমি এই রকম ভাবিও নি।"

"ভাবেন নি, অথচ এই দৃশ্যটি হবে সবচেয়ে জোরালো। এইরকম না করলে প্রথম অঙ্কের ভাল সমাপ্তি তো আর–কোনোরকমে হতেই পারে না।"

" দেখুন, এই দৃশ্যটা হচ্ছে সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বৈঠকখানা।" নাট্যকার আবার বললেন।

"তা হোক। কিন্তু সিঁড়ি থাকবে বেশ উঁচু। এক সারি বড় বড় সিঁড়ি।"

"সিঁড়ি? সিঁড়িতে কি হবে?"

"উমাতারা তার উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলবে 'কক্‌খনো না দীনেশ, কক্‌খনো না।' এই কথাটাকে জোরালো করার জন্য চাই সিঁড়ি, বুঝেছেন, সিঁড়ি হবে অন্তত দশ ফুট উঁচু, তৃতীয় অঙ্কে কালীচরণ এর উপর থেকে লাফ দেবে।"

"লাফ দেবে? লাফ কেন দেবে?"

"এইখানটায় আপনি লেখেন নি যে যেন ছিটকে এসে সে ঘরে ঢুকলো? বেড়ে লিখেছেন। ঐ, লাফ দিয়ে ছিটকে গিয়ে ঘরে ঢুকবে। এখানে ঢোকাটা যা 'স্ট্রাইকিং' হবে মশাই। আপনি তো জানেন, নাটকে কি চাই– কেবল প্রাণ চাই, প্রাণ। এমনি করেই নাটক প্রাণবান হয়ে ওঠে।"

নাট্যকলার গভীরে তলিয়ে যেতে যদি পারেন তো দেখবেন, মঞ্চের সঙ্গে সংযোগ রাখবার বাসনা যাঁর নেই, তিনি হচ্ছেন সৃষ্টিশীল নাট্যকার, আর মূল গ্রন্থের সঙ্গে সংযোগ রাখবার বাসনা যাঁর নেই, তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টিশীল প্রযোজক। আর সৃষ্টিশীল অভিনেতা,–এ বেচারার মাত্র দুটি পথ বেছে নেবার আছে, হয় তাকে নিজের মনের মত অভিনয় করতে হয় (এরূপ ক্ষেত্রে নাটক ভুল পথে প্রযোজিত হচ্ছে বলে প্রযোজনাকে দায়ী করা হয়) নতুবা তাকে প্রযোজকের ধারণামাফিক চলতে হয় (এরূপ ক্ষেত্রে অভিনেতাকে দায়ী করা হয় যে, নাটক সে বুঝতেই পারে নি)।

গ্রহ-নক্ষত্রের কোন এক অপূর্ব যোগাযোগের ফলে দেখা গেল অভিনয়ের প্রথম রাত্রিতে সংলাপ কারো মুখে ঠেকল না, খটখটে নড়বড়ে সিনসিনারিগুলো ধ্বসে পড়ল না, লাইটগুলোও 'ফিউজ' হল না, আর কোন বাধাবিপত্তি এসেও পথ রোধ করল না। তখন সব কিছুর প্রশংসা পায় প্রযোজক। সমালোচকরা তারই পিঠ চাপড়ে বলে 'বেড়ে মাল হয়েছে দাদা'! তবে এরূপ হওয়া কেবল দৈবেরে ঘটনা। এই প্রথম রজনীর অভিনয়ে উপস্থিত হতে গেলে মহড়ার অনেক খুন-খারাবির মধ্য দিয়ে আমাদের এগুতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পাঠ

আপনি যদি নাট্যকার হন, কিংবা হতে চান, মহড়ার প্রথম দিন উপস্থিত না থাকতে আপনাকে পারামর্শ দিচ্ছি। সে বড় বিরক্তিকর ব্যাপার। সাত-আটজন অভিনেতা যাঁরা উপস্থিত হন, তাঁরা বেজায় ক্লান্ত; কেউ-বা বসে, কেউ-বা দাঁড়িয়ে, কারো আসে কাসি কারো বা হাঁচি, নিরতিশয় বিরক্তিতে তারা ভেঙে পড়ে। প্রযোজক এক সময়ে হাঁকে, "এবার শুরু করি, কেমন?"

তাঁরা অনিচ্ছায় আসন গ্রহণ করেন।

'উমার বর', চার অঙ্কের প্রহসন নাটিকা। এক গরীব মধ্যবিত্তের বৈঠকখানা। ডানদিকে দরজা, বাঁদিকে শোবার ঘর। দীনেশ এসে ঢুকল। কোথায় দীনেশ–দীনেশ।

কে একজন বলল, "সে তো 'আতসবাজি' নাটকে স্টেজ রিহার্সেল দিতে গেছে!"

"তার পার্ট তাহলে আমারই বলতে হচ্ছে। দীনেশ ঢুকল, বলল, 'উমাতারা, কি যেন আমার হয়েছে। উমাতারা?"

কেউ সাড়া দিল না।

" কোথায় উমাতারা? গেছে কোন্ চুলোয়?"

কে একজন বলল, "সে যে বিক্রমপুরের এক জমিদার বাড়িতে নাচতে গেছল আজও ত' ফেরে নি।"

"তবে তারও পার্ট আমাকেই বলতে হচ্ছে।" সে উমাতারা আর দীনেশচন্দ্রের সংলাপ আবৃত্তি করে চলল। কেউ তার কথা শুনছে না। যে যার আলাপে মশগুল।

প্রযোজক–"এবার কালোশশী ঢুকবে। কুমারী অঞ্জুবালা, অ কুমারী অঞ্জুবালা, তুমি কালোশশী হয়েছ কিন্তু।"

"জানি গো মশাই জানি।"

"তবে পার্ট পড়। প্রথম অঙ্ক। কালীচরণ ঢুকল–"

"পার্ট আমি বাড়িতে ফেলে এসেছি।"

প্রযোজক এবার কালীচরণ-কালোশশীর পার্ট নিজেই পড়ে চলল। কেউ শুনছে না, একজন ছাড়া। সে নাট্যকার নিজে।

প্রযোজক–"এবার দুঃখহরণ সরকারের ইংরাজি-জানা গিন্নির পার্ট। কই, ইংরাজি-জানা গিন্নি– ঘোমটা খুলে মুচকি হেসে বলবে, "আমার হাসবেন্ড বাড়ি নেই–"

গিন্নি কপি হাতে নিয়ে তার পার্ট বলছে, "আমার সার্ভেন্ট বাড়ি নেই।"

"হাসবেন্ড।" প্রযোজক শুধরে দেয়।

"উঁহু, আমার কাগজে সার্ভেন্ট লিখে দিয়েছে। এই দেখুন না।"

"ওটা নকল করার সময় ভুল হয়ে গিয়েছে।"

"ভুল হয়ে যায় কেন? খালি আমাদের ভুলই ভুল, ওদের বেলা সাত খুন মাপ।"

দেখে শুনে নাট্যকার একেবারে দমে গেল। মনে হল, তার মত অত খারাপ নাটক পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেউ লেখেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার পরবর্তী স্তর শুরু হয়। স্থান রিহার্সেল কক্ষ। প্রযোজক ও কুশিলবেরা।

প্রযোজক–"এই যে দেয়ালে ছবি ঝুলছে, ধরে নাও ও একটা দরজা। আর ওই ফাঁকা জায়গাতে আরেকটা দরজা। সামনে গোল টেবিল আর একটা হারমোনিয়াম। এদিকের দরজা দিয়ে উমাতারা ঢুকে হারমোনিয়ামে হাত দেবে, ওদিকের দরজা দিয়ে ঢুকবে দীনেশ। কই দীনেশ, আই মিন আলেখ্য বিশ্বাস?"

একসঙ্গে দুজনের কণ্ঠ শোনা গেল, "তিনি 'ভবতারিণীর খাট' চিত্রের মহড়া দিতে চন্দ্রাবলী স্টুডিওতে গেছেন।"

"আচ্ছা, তার পার্ট আমিই বলছি।" প্রযোজক কাল্পনিক দরজার দিকে এগিয়ে গেল : "উমা, আমার যেন কি হয়েছে উমা, এখন উমা, আই মিন লীনা বাগচি, আপনি তিন পা এগিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াবেন, আর বেশ অবাক হয়ে গেছেন এই ভাব দেখাবেন। উমা, আমার যেন কি হয়েছে উমা। এখন দীনেশ জানলার কাছে এগিয়ে যাবে। এই চেয়ারটাতে বসবেন না যেন, জানেন না, ও হচ্ছে জানলা। আচ্ছা, আবার। আপনি ঢুকবেন বাঁ দিক থেকে দীনেশ ঢুকবে বিপরীত দিক থেকে। 'উমা, আমার যেন কি হয়েছে উমা।"

"বাবা, বাবা, সে চলে গেল, সে চলে গেল বাবা।"

প্রযোজক, "ও কি পড়ছেন?"

"প্রথম অঙ্কের দুয়ের পাতা।"

"প্রথম অঙ্কের দুয়ের পাতায় ও রকম কিছু লেখা নেই।" বলে প্রযোজক লীনার হাত থেকে পার্ট ছিনিয়ে নেয়, "কই দেখি। হায়রে হায়, এ তো এ বইয়ের পার্ট নয়, অন্য কোন বইয়ের।"

"ও হাঁ, ওরা–মানে ওরা কাল পাঠিয়েছিল। বদল হয়ে গেছে।"

" স্টেজ ম্যানেজারের বই দেখে আজকের মতো তো চালান। এই দেখুন, আমি ডান দিক থেকে ঘরে ঢুকছি।"

"উমা, আমার কি যেন হয়েছে উমা"–লীনা পড়তে শুরু করে।

"ও ত আপনার পার্ট নয়। উমা আপনি, আমি নই।"

এইভাবে এগিয়ে চলল। এল কালীচরণের পার্ট।

কালীচরণ ঘড়ি দেখ বলল, "মাই গড। শান্তা স্টুডিওর গাড়ি বোধ হয় এসে গেছে। কি করব, আধ ঘণ্টা ধরে তো দাঁড়িয়েছিলাম। আচ্ছা চললুম, নমস্কার।"

নাট্যকার ভাবে সব কিছু দোষ তার নিজের। দীনেশ অনুপস্থিত, কালীচরণ চলে গেল। সংলাপের কোনো মহড়াই হল না।

ঝি বলছে, "কালীচরণবাবু এসেছে।" আর উমা বলছে, "তাকে ভেতরে নিয়ে এস," এইটারই সাতবার পুনরুক্তি করে প্রযোজক সবাইকে ছুটি দিল।

নাট্যকার বেদনাদগ্ধ মন নিয়ে ঘরে ফিরে এল। মনে মনে বলতে লাগল, এভাবে চললে সাত বছরেও মহড়ার কিছুই হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো মহড়া

রিহার্সেল কক্ষ। এখানে দেয়ালে-টাঙানো ছবি হয় দরজা, ভাঙা টেবিল হয় হারমোনিয়াম, শোলার টুপি হয় তুলসী-মঞ্চ। মহড়া হয় বইয়ের শেষ দিক থেকে, এগিয়ে আসে গোড়ার দিকে। ছোট ছোট দৃশ্য বিশবার মহড়া দেয়। বড় বড় দৃশ্যে হাতও পড়ে না। অর্ধেক পাত্রপাত্রী সর্দিগরমির দরুণ অনুপস্থিত, অনেকে পর্দায় মহড়া দিতে যায় বলে এদিকে আসতেই চায় না। তা সত্ত্বেও কাজ এগিয়ে চলে, নাট্যকার বুঝতে পারে, বিশৃঙ্খলার নীহারিকা পিণ্ড সত্যি সত্যি একটা আকার নিয়ে দানা বাঁধছে।

তিন-চার দিনের মধ্যে আরেক ব্যক্তির শুভাগমন হয়। তিনি প্রম্পটার। এখন থেকে কুশিলবরা পার্ট আর পড়ে না, অ্যাক্ট করে। অ্যাক্টে, পাকা-পোক্তরূপ অঙ্গসঞ্চালনাদি দেখে নাট্যকারের আনন্দ ধরে না। সে ভাবে, প্রথম অভিনয় আজ রাতেই তো হতে পারে। অভিনেতারা বলে, আগে স্টেজে রিহার্সেল দিয়ে নিই, তবে তো প্রথম রজনী! অবশেষে অর্ধসমাপ্ত নাটক মঞ্চে দেখা দেয়–পর্দার ওপারে তারা তখনো মহড়া চালাতে থাকে। প্রম্পটার টেবিলে বসে বলে যায়। কিন্তু হচ্ছে না মোটেই।

তিন-চার মহড়ায় বাকি দোষ-ত্রুটি সারিয়ে নিয়ে প্রযোজক আদেশ দেয় প্রম্পটারকে প্রম্পটিং বন্ধ এ গিয়ে বসতে। এই সময় ঝানু অভিনেতাদের মুখও আমসি হয়ে যায়। তার কারণ, সেই আদি ও অকৃত্রিম "কিছুই হচ্ছে না।' এই সময় তারা কি বলছে, প্রযোজকের খেয়াল সেদিকে থাকে না। তারা কি করছে, খেয়াল থাকে সেদিকে।

AMARBOI.COM

ড্রেস-রিহার্সেল

ড্রেস-রিহার্সেল বড় মজার জিনিস। সবকিছুই তৈরি হচ্ছে, অথচ কোনটাই সম্পূর্ণ হচ্ছে না। নায়কের কোটে এখনো বোতাম লাগানো হয়নি, নায়িকার জন্য মোস্ট আপ টু-ডেট ব্লাউজখানা দরজির এখনো মনের মতন হয়নি; সিনসিনারিতে রং লেগেছে, শুকায় নি। কত কিছু দরকার– কোথায় সব? না, পাওয়া গ্রাচ্ছে না। শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এল, অথচ পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থার মধ্যেই ড্রেসরিহার্সেল শুরু। কি যে ঘটবে, দেখবার জন্য নাট্যকার স্টলে চুপ করে বসল। অনেকক্ষণ ধরে কিছুই ঘটল না। মঞ্চ খালি পড়ে আছে। অভিনেতৃগণ আসছে, হাই তুলছে, আর ড্রেসিং-রুমে অন্তর্হিত হচ্ছে। কেউ কেউ বলছে, "পার্টে এখনো চোখ বুলুতে পারিনি।" তারপর আসছে সিনারি, আর গড়িয়ে গড়িয়ে আনছে মিস্ত্রিরা। নাট্যকার অধৈর্য–বড় ঢিমে তেতালায় চলছে, পারতুম যদি নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে হাত মেলাতুম, তবু একটু এগুত। পান-চিবানো পায়জামা-পরা একটি ছেলে একখানা ক্যাম্বিসের দেয়াল টেনে আনল। আনা হল, আরেকখানা। চমৎকার। তৃতীয় দেয়ালখানা এখনা পেন্টিং-রুমে; কাজেই আপাতত ওদিকে একখানা কাপড় টাঙিয়ে দাও, কাজ ত চলুক, প্রযোজক বলে দেয়।

"হাঁ কাজ চলুক।" নাট্যকারের গলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রযোজক, "ওহে প্রম্পটার, স্টেজ ম্যানেজার প্লিজ।"

স্টেজ ম্যানেজার, " রেডি।"

পরদা পড়ল। ঘরময় আঁধার। নাট্যকারের বুক লাফাচ্ছে–এতক্ষণে, এতক্ষণে তার নাটক সে দেখতে পাবে।

স্টেজ ম্যানেজার প্রথম বেল বাজালেন। যা ছিল শুধু কথার সমষ্টি, এতক্ষণে তা শরীরী রূপ নেবে। দ্বিতীয় বেলও বাজল; কিন্তু পরদা তো কই উঠছে না। তার বদলে পরদা ভেদ করে ইথারে ভেসে আসছে ভিতরে দুই কণ্ঠের কোন্দল ধ্বনি।

"আবার ওরা তর্ক বাধিয়েছে," বলে প্রযোজক চটেমটে ভেতের ঢোকে।

অবশেষে আবার বেল বাজল এবং ঝাঁকুনি খেয়ে পরদাটাও উঠল।

সম্পূর্ণ নূতন একজন মঞ্চে এসে দেখা দেয়, বলে, "উমা, আমার কি যেন হয়েছে, উমা!"

একজন মহিলা ওদিক থেকে এগিয়ে আসে, "কি হয়েছে দীনেশ?"

"থামো! এই জানালায় চাঁদের আলো দেখা যাচ্চে না, চাঁদের আলো কই?"

মঞ্চের তলা থেকে কে বলে ওঠে, "চাঁদের আলো ত দিয়েছি!"

"একে তুমি চাঁদের আলো বলছ! আরো আলো চাই; বেশি করে ঘুরিয়ে দাও।"

রঙ্গমঞ্চের অন্তরাল একদম ঝামেলায় ভরতি। প্রযোজকের সঙ্গে সঙ্গে এখানে আরো অনেকে যার যার স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। যেমন সিন্-আর্টিস্ট, স্টেজ ম্যানেজার, বড়ো মিস্ত্রি, বিদ্যুৎ বিভাগের বড়ো মিস্ত্রি, কারুকৃৎ, প্রপার্টিম্যান, প্রম্পটার, মাস্টার টেলর, মাস্টার ড্রেসার, ফার্নিচারম্যান, স্টেজ ফোরম্যান ও আরো অনেক যান্ত্রিক বিশারদ ব্যক্তি। সজ্জনদের এই সম্মেলনে কেবল ধারালো অস্ত্র ব্যবহার ছাড়া সব কিছুই ব্যবহার হয়, যেমন চীৎকার, ফেটে পড়া, দাঁত কিড়মিড় করা, চাপা গলায় গালি দেওয়া, গলা ছেড়ে গালি দেওয়া, এক মুহূর্তে চাকুরি খাওয়া, আত্মসম্মানে ঘা খেয়ে টগবগ করে ফোটা, পরিচালকের কাছে নালিশ করা, কথায় রঙ লাগিয়ে শ্লেষ করা এবং হিংসা ও ক্রোধোদ্রেককারী আরো অনেক কিছু করা।

এতে আমি বলতে চাই না যে, থিয়েটারের আবহাওয়া নিতান্ত বুনো কিংবা ভয়ঙ্কর। সে সব কিছু নয়। এর আবহাওয়া একটু খিটখিটে আর খ্যাপাটে ধরনের, এই যা। বড় বড় থিয়েটারগুলো নানা বিরুদ্ধমনা লোক আর বিপরীতধর্মী কাজের সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। পরচুলা পরাবার লোক থেকে শুরু করে, যার প্রযত্নে নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হয় সেই প্রযোজক পর্যন্ত সকলের মধ্যে এর দূরতিক্রমনীয় বিরুদ্ধ মতের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রপার্টিম্যান আর ডেকরেটারের মধ্যে রুচির এক চিরন্তন সংঘর্ষ বিদ্যমান। টেবিলে কাপড় বিছানো ডেকরেটারের কাজ, আবার ঐ টেবিলেই প্লেট কাপ রাখার কাজ পড়ে প্রপার্টিম্যানের কাজের আওতায়। আবার ঐ টেবিলেই যদি ল্যাম্প রাখতে হয় তো সে কাজ বিদ্যুৎ মিস্ত্রির দায়িত্বাধীন।

প্রভু বললেন, "আলো হোক!" অমনি আলো হল। বাইবেল এটুকু বলেই নিরস্ত হয়েছে। সে আলো কেমন হল; হলদে, লাল, নীল না বেগুনি সে সব কিছুই বাইবেলে লেখা নেই। সে আলো কত 'ওয়াটের'–পঞ্চাশ-এক শ' না হাজার। সে কি 'আর্ক', না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ফ্লাট', 'ব্যাটেন' না 'ফোট'–সে সম্বন্ধেও বাইবেল নিশ্চুপ। 'ডিমার', 'রিফ্লেক্টার', 'শ্যাডো'– সে সব তো দূরের কথা। প্রভু এ-ও বলেন নি, " সেকেন্ড ব্যাটেনের সুইচ্ খুলে দাও, ঢালা নীল আলো ছাড়ো–না না, নীল চাই না–চাঁদি চাই, চাঁদি আলো।" প্রভুর সময় এসব ঝামেলা ছিল না। তখন সময় ছিল সহজ। তার কারণ, তখন থিয়েটার ছিল না। তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন আলো, তারপরে মানুষ, তার পরে থিয়েটার। ড্রেস রিহার্সেলকে "আলো হোক" ব্যাপারটির রিহার্সেল বলা চলে। পার্থক্য এই, প্রভুর সময়ে ব্যাপারটি যত সহজ ছিল, এ ক্ষেত্রে তত সহজ নাই।

নায়ক হাঁক দিলেন প্রযোজককে, "মশাই, রিহার্সেল কি আমরা করব, না করব না।"

চীৎকার-ক্লান্ত প্রযোজক ফেটে পড়েন, " কেন, করেন নি কেন? কি করছেন এতক্ষণ ধরে?

"উমা, কি যেন আমার হয়েছে উমা!"

প্রযোজক, "এই, এই, হচ্ছে না, থার্ড ব্যাটেনের আলো অর্ধেক কমিয়ে দাও।"

আমার কি হয়েছে দীনেশ?

"আরো হবে, আরো। আরো নীচু করো। কথাও, আরো কমাও।"

বিদ্যুৎ-মিস্ত্রি, "মশাই, থার্ড ব্যাটেনের আলো একবোরেই নিবে গেছে–আর কমানো চলল না।"

"নিবে গেছে? তবে ওখানে জ্বলছে ওটা কি?

"ওটা অ্যাক্টি? এরিয়া লণ্ঠন। অ্যাক্টিং এরিয়াতে ওটা জ্বালিয়ে রাখতে আপনিই বলেছিলেন।"

"থামো, আমি কি বলেছিলাম, না বলেছিলাম তোমার দেখে কাজ নেই। তুমি অ্যাক্টিং এরিয়া লণ্ঠন নিবিয়ে দাও, আর, দেখ, থার্ড ব্যাটেনের সুইচটা ছ' অবধি তুলে ধর।"

"তোমার কি হয়েছে দীনেশ?"

"ভুল হয়েছে। অ্যাক্টিং এরিয়াতে হলদে আলো চাই–'ফ্লোট' মারো।"

এক মুহূর্ত সব চুপচাপ–স্তব্ধ, শান্তিপ্রদ নীরবতা।

প্রযোজক, "ওকি, কেউ কিছু বলছে না যে।"

স্টেজ ম্যানেজার, "উমা ওদিক দিয়ে কোথায় যেন গেল স্যার।"

"যাওয়া উচিত হয় নি। তাকে এক্ষুনি স্টেজে যেতে হবে।"

"কিন্তু।"

"রাখুন আপনার 'কিন্তু'। শুরু হোক।"

শুরু হয়।

"উমা, আমার যেন কি হয়েছে উমা।"

" তোমার কি হয়েছে দীনেশ?"

এমন সময় দুজন লোক একটা 'সাইড-সিন' টেনে নিয়ে এলো এবং জানালার ধারে সেটা দাঁড় করাতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুর সপ্তমে চড়িয়ে প্রযোজক বলেন, " তোমরা এখানে কি চাও?"

"পরদা টাঙাতে চাই।" বলে তারা নির্লিপ্তভাবে সিঁড়িতে পা দিল।

"কি টাঙাতে চাও? কিসের পরদা? ভাগো। কেটে পড়। আগে টাঙাওনি কেন?"

"কাপড় আগে পাঠানো হয়নি বলে", "তৈরি করতে দেরি হয়েছে স্যার"–টেকনিক্যাল এজেন্ট এই কথা বলতে না বলতেই প্রযোজক চটেমটে তাকে মারতে এলো; তাকে ধাক্কা মারতে এলো, সিঁড়ি মইগুলোকে লাথি মারতে এলো, উপস্থিত যারা ছিল তাদের প্রত্যেককে দলিত, মথিত ও বিমর্দিত করতে এলো এবং এসে থেমে গেল।

নাট্যকার চোখ কান বুজে বসল। তার তাক লেগে গিয়েছে। এরই নাম ড্রেস রিহার্সেল। প্রকৃতির উপর যেমন ঝড় আসে, এখানেও তেমনি ঝড় আসে। এখানে সবাই রেগে আছে–প্রযোজক, অভিনেতা, মিস্ত্রিরা, সবাই। রাগ, অসন্তোষ, ক্লান্তি, বিরক্তি, বিমর্ষতা,–সবকিছু মিলে বিদ্রোহ জাগায়–এই, ক্লান্তিদায়ক, এই নিরবয়ব নাট্যশালা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য। এই হচ্ছে ড্রেস রিহার্সেলের সত্যিকার 'মুড'।

অবশেষে প্রযোজক স্টলে তার নিজের জায়গায় ফিরে আসেন। দেখে তাকে মনে হয় দশ বছর বুড়িয়ে গেছেন। ভাঙা গলায় বলেন, "আবার শুরু হোক।"

"উমা, আমার কি যেন হয়েছে, উমা।" নায়ক বলে।

" তোমার কি হয়েছে দীনেশ?" নায়িকার কণ্ঠে গাঢ়তা।

শ্রান্তি, বিমর্ষতা এবং তিক্ততার মধ্য দিয়ে এভাবে ড্রেস রিহার্সেল এগিয়ে চলে।

"খারাপ! স্রেফ খারাপ হচ্ছে", প্রযোজকের গলায় সহসা অসম্ভব জোর এসে যায়; "কিছুই হচ্ছে না, আবার ফিরে শুরু করতে হবে।" অভিনেতৃদল ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে, তাদের পা কাঁপে, গলায় কথা বসে যায়, স্মৃতিশক্তি উবে যায়, মনে শুধু এই জিজ্ঞাসা কতক্ষণ এর শেষ হবে।

অবশেষে এর শেষ ঘনিয়ে আসে। অভিনেতাদের মুখে কথা নেই। তারা ছাড়া পাওয়া বন্ধ জলার মাছের মতো বাইরে মুক্ত বায়ুতে গিয়ে হাঁফ ছাড়ে। নাট্যকার কাঁধে এক বোঝা ক্লান্তি নিয়ে মাথা নিচু করে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। কাল প্রথম রজনী। যা দেখছে, তাতে প্রথম রজনী তার চোখে শেষ রজনীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

হায় নাট্যকারবৃন্দ, হায় প্রযোজক আর অভিনেতার দল! হায় ছুতোর মিস্ত্রি, বিদ্যুৎ মিস্ত্রি, সজ্জাশিল্পী, কারুশিল্পীর দল! তোমরা সবাই জান– ড্রেস রিহার্সেল কতখানি বিরক্তিকর। তবু তোমরা আবার পরবর্তী ড্রেস রিহার্সেলের দিনটির প্রতীক্ষা কর! সে কি ক্লান্তি আর বিরক্তিকর বলেই?

নাটকে নাট্যকারের স্থান

নাট্যকার নাটক লিখে থিয়েটারে দেবার পর যে-সমস্ত কাণ্ডকীর্তন হয়, তার কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। প্রথমবারের 'পাঠের' পর সে নাটকের কি চেহারা হয়, তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম রিহার্সেল থেকে ড্রেস পর্যন্ত যা ব্যাপার ঘটে, তারও কিছু কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। নাট্যকারের রচিত কথা থিয়েটারের অবয়বে রূপ পেতে দেখে নাট্যকার কেমন বোধ করে, তাও দেখানো হয়েছে। আরো দেখিয়েছি–নাট্যকার তার নাটক নিয়ে তার-কেন্দ্ররূপে বিরাজ করে–আর সমগ্র থিয়েটারি পদ্ধতিটা কিভাবে আবর্তন করে।

দেখেছি, লেখক যা লিখেছিল, তার মধ্য দিয়ে নাট্যকলা লক্ষ্মীকে সশরীরে উদ্বোধনের জন্য কি রকম সাংঘাতিক জটিলতার উদ্ভব ঘটে, অথচ, নাটক রচনায় নাট্যকার অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও (নাট্যকার ছাড়া কে আর নাটক লিখতে পারে বলুন) নাট্যশালায় নাটক-অগ্রগতির ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাকেই মনে হয় সবচেয়ে নগণ্য। নাটক নিয়ে সবাই ব্যস্ত। ও বেচারার কথা কাকেও বড় কানে নিতে দেখা যায় না। কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞাসাও বড় একটা করে না। নাট্যশালার শশব্যস্ত "বিদারণ আর উদ্‌গীরণাত্মক" ভাবের মধ্যে নাট্যকারকে মনে হয় একমাত্র ব্যতিক্রম। একমাত্র সেই এর মধ্যে ঝঞ্ঝাট আর ঝকমারির পাত্র নয়। 'ফ্লাড লাইট' বা 'স্পট লাইট' দিয়ে তার ব্যক্তিক অবয়বকেও উজ্জ্বল করে দেখানো হয় না। রঙ মেখে সঙ সাজার বালাইও তার নেই। অভিব্যক্তি প্রকাশের সুবিধার জন্য তার পায়ের তলায় সিঁড়ি আর পিঠের পাশে দরজা রাখারও প্রয়োজণ নেই। অথচ তার নাটক-লেখক হওয়ার দরুণ এখানে যা-কিছু ঘাতপ্রতিঘাতের, তোল-পাড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

নাটকের খাতিরে, তাকে উৎকর্ণ হয়ে সব কিছুর দায়িত্বের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিতে হয়। তবু সারাক্ষণ তার মনে হয়, এখানে তার কোনো গুরুত্ব নেই। সে যে এতবড় একটা যজ্ঞকাণ্ডের মূল পুরোহিত, এ কথা যেন কেউ মনেই আনতে চায় না। আসবাববাহীরা টেবিল চেয়ার বয়ে নিয়ে যথাস্থানে রাখে–নাট্যকার যেন তাদের আসাযাওয়া পথের একটা বিঘ্ন মাত্র; এছাড়া আর কিছুই নয়। সে কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, কাজে লাগাতে পারে না। বরং বিদ্যুৎ মিস্ত্রি আর ছুতোর মিস্ত্রিদের যাতায়াতের ব্যাঘাত ঘটায় বলে, অপরাধীর মত, সে নাট্যমঞ্চের অভ্যন্তরে সন্তর্পণে পায়চারি করে।

কার্যতও তাই। শুধু তাই নয়, আরো বেশি। বস্তুত নাট্যকার নিজেকে, সেখানে যতখানি নগণ্য মনে করে, তদপেক্ষা সে আরো অধিক নগণ্য। তার সবটা কাজই তখন অপরের দায়িত্বের অধীন হয়ে গেছে। প্রযোজক নিজের মনে এই দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করে নেয় যে, নাটকটা হতো খুবই ভালো, কেবল নাট্যকার তার গল্প দিয়ে ওটাকে মাটি করে দিতে বসেছে। প্রযোজক নিজে কি সুন্দর নাটকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে, অথচ নাট্যকার তার বই দিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। কাজেই, যে বইয়ের আদৌ কোনো নাট্যকার নেই, সেই হবে শ্রেষ্ঠ নাটক। অভিনেতা অভিনেত্রী না থাকলেও বোধ হয় ভাল হত, কেন না, নাটকের সাফল্যের মূলে এরাও এক একটা প্রতিবন্ধক। প্রযোজকের সৃষ্টিকার্য যেমন কঠিন, তেমনি কঠোর। যা লেখা হয়েছে তাঁকে তার চাইতেও মহৎ কিছু উত্তম কিছু সৃষ্টি করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম রজনী

অবেশেষে প্রথম রজনীর সাংঘাতিক মুহূর্তটি ঘনিয়ে এল। এবার নাটকখানা একটা 'বস্তু'তে পরিণত হবে, একটা ঘটনা হয়ে দেখা দেবে। শেষ মহড়া পর্যন্ত এর পরিবর্তন আর পরিবর্জন চলে। কারণ এ তখনো বস্তু হয়ে ওঠেনি। পৃথিবী যেমন কাঠিন্য প্রাপ্তির পূর্বে ছিল অগঠিত, উত্তাপের আকার বিশেষ, নক্ষত্র যেমন শুরুতে ছিল নীহারিকার ধূম্রজালে নিরবয়ব অগঠন; এও ছিল ঠিক তেমনি। তাকে নিজের পথে চলবার, গতি নেবার অধিকার দেওয়া হয় যখন– সে হল প্রথম রজনী। এই সময়ে নাট্যকার বা প্রযোজক আর নিজের ঘাড়ে বোঝা না রেখে অপরদের ঘাড়ে তুলে দেয়। এখন আর প্রতিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়ার তাদের আর সুযোগ থাকে না।

প্রথম রজনীর সকাল বেলা হয় শেষ মহড়া। কুশীলবরা অতি দ্রুত তালে, সুর না করে, কেবল চাপা গলায় পাঠগুলো আওড়াতে থাকে–চাপা গলায়, তার কারণ, সকালে পাঠ পড়ে বিকালের গলা পাছে নষ্ট হয়, ভেঙে যায়।

প্রথম রজনীর একটা নিজস্ব ভঙ্গি, স্বকীয় সত্তা আছে। প্রথম রজনী হচ্ছে চিরকেলে প্রথম জননী। জনসাধারণের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যারা মাত্র প্রথম রজনীতে থিয়েটার দেখতে যায়। তারা নাট্যানুরাগপ্রবণতার তাগিদে, কৌতূহলের পরবশতায় কিংবা বাহাদুরি দেখবার জন্য অথবা বন্ধুদের মনোরঞ্জনার্থ তাদের নিয়ে অথবা প্রণয়িনীদের কাছে নিজের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য তাদের নিয়ে প্রথম রজনীতে থিয়েটার দেখতে যায়। তারা যাবেই, এবং প্রথম রজনীতেই যাবে, আর কোনো রজনীতে নয়। এই হচ্ছে অনেকের অভিমত। এ অভিমত সত্য কিনা জানি না। তবে আমার অভিমত হচ্ছে, তাদের এ যাওয়ার মধ্যে এক নৃশংস নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান। অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্খলন ও বিচ্যুতি, নাট্যকারের মর্মবেদনা এবং প্রযোজকের মনোপীড়া–এগুলিকেই নিতান্ত জান্তব রক্তপিপাসার তাগিদে প্রাণ ভরে ভোগ করার জন্য তারা প্রথম রজনীতেই যাবে এবং প্রথম রজনীতে যাবেই।

পুরোনো রোম নগরীতে প্রথম যুগের খ্রিস্টভক্তদের উপর নির্যাতন প্রত্যক্ষ করবার জন্য যেমন নৃশংস মনোবৃত্তি নিয়ে লোকে সার্কাসে যেতো, প্রথম রজনীতেও লোকে যায় সেই মনোবৃত্তি নিয়ে। সেদিন থাকে এমনি একটা ভাব : যে কোনো মুহূর্তে এই বুঝি সব ভেস্তে যাবে, মঞ্চের উপর যা হচ্ছে, এই বুঝি কোনো একটা কারণে সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাদের এই মর্মন্তুদ অবস্থাকে উপভোগ করা আর যাই হোক রসিকের কাজ নয়।

প্রথম রজনীতে দর্শকরা যখন স্ব স্ব আসনে বসে মৃদু গুঞ্জন করতে থাকে, নাট্যকারকে তখন দেখা যায় হলের এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করছে কিসের এক অসহ্য অননুভূত উৎপ্রেরণার চাপে। কুশীলবরা মেক-আপ নিয়ে আড়াল থেকে হলের দিকে উকি মারছে। সবারই চোখে 'প্রথম রজনীর আতঙ্কের ছাপ।' সাজের কক্ষ থেকে শোনা যাবে রাগ বিরাগের পালা; টুপিটা খোলতাই হয়নি, শাড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না; অমুকটা আমার না হয়ে অমুকের হল কি করে। ইত্যাদি। প্রযোজক গজরাতে থাকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যের সিনারি এখনো এসে পৌঁছলো না। স্টেজ ম্যানেজার ড্রেসিং রুমের জন্য শেষ ঘন্টা মেরেছে, সব কিছু তৈরি; তারপরে দেখা গেল শেষ সিনারি তৈরি হয়ে পৌঁচেছে।

এই সময়ে আপনি গুঞ্জনমুখর হলের মধ্যে বসে, হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে যদি বলেন, "নাঃ, এতক্ষণে শুরু হওয়া উচিত ছিল", সেই মুহূর্তে যদি পরদার দিকে কান পাততে পারতেন তো শুনতে পেতেন : হাতুড়িঠোকার সঙ্গে মনুষ্যকণ্ঠের চাপা আওয়াজ।

"বলি ওটা রাখব কোথায়?"

"এটা আবার এখানে ঢোকাচ্ছিস, বোকা কোথাকার।"

"এই, এদিকটা ঠেলে ধর, পড়ে না যায়।"

" রেখে দে, আজ আর হয়ে উঠলো না। কাল দেখা যাবে।"

ক্রিং। প্রথম ঘন্টা পড়ল। আলো নিবলো। হল নিশ্চুপ। তবু ভেতরে হাতুড়ির শেষ কটা আঘাতের শব্দ শুনতে পাবেন। আর পাবেন ভারি ভারি চেয়ার টেবিল টানার শব্দ। আর চাপা চিৎকার

"ওটা থাক এখন সরো!"

"এটা ঠেলে ধর। জলদি।"

ক্রিং। পরদা উঠছে। যারা কাজ করছে তাদের পায়ের গোড়ালির উপর দিয়ে পরদা উঠল।

আর তার সঙ্গী। কপালে স্বেদবিন্দু। কিন্তু দর্শকের আসন থেকে তা চোখে পড়বে না। সঙ্গী ঢুকলো সাহেবী কায়দায়। টুপিটা টেবিলে না রেখে রাখল চেয়ারের উপর। রাখল বললে ঠিক হবে না। যেন ছুঁড়ে মারল। কণ্ঠে গাঢ়তা এনে বলল, "গুড্ মর্নিং, ভাল আছ উমা?" সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিল : "আই মিন (অনুচ্চ), উমা, আমার কি যেন হয়েছে উমা!"

উমার মুখ ভয়ে বিবর্ণ। সে খেই হারিয়ে ফেলল। সব ভুলে মেরে দিয়ে উপস্থিত বলে ফেলল, "গুড মর্নিং।"

" ..... আমার কি যেন হয়েছে।" বলে দিল প্রম্পটার চাপা কণ্ঠে।

কি বলবার ছিল তার সঙ্গে খেই রাখতে গিয়ে অভিনেতা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগল। সে স্মরণে আনলো যে, নাট্যকারের মতে এখন মর্নিং নয়। বিকেলের শেষ।

উমা অনুচ্চকণ্ঠে বলে দেয়, "এখন তো মর্নিং নয়; ভেবে চিন্তে শুরু করুন।"

"ও হ্যাঁ, ঠিক। উমা, কি ..... ও হ্যাঁ!"

"তোমার কি যেন একটা হয়েছে, তাই না?" উমা চাপা গলায় তাকে সাহায্য করতে লাগল।

"হাঁ হাঁ", সঙ্গী উৎসাহিত হয়ে উঠল, "উমা, আমার কি যেন হয়েছে, উমা।"

"তোমার কি হয়েছে?" উমা টপ করে বইর সঙ্গে খেই মিলিয়ে দিল। নাট্যকার তার বক্সে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। ওঃ, যা দুর্ভাবনা তার হয়েছিল। যা হোক, উপস্থিত বাঁচা তো গেল। কিন্তু তার মগজ বুঝি বা বিগড়ে যাবে। ইচ্ছা হল, বক্স থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাফিয়ে দর্শকদের মাঝখানে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে বলে, "আবার শুরু কর, এটা এ রকম তো হবে না। আবার শুরু কর। আর একবার।" ধীরে ধীরে সে আপনা থেকে শান্ত হয়ে আসে।

মঞ্চের উপর সংলাপগুলি বিদ্যুতের ছুরির মতন ধ্বনিত হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে উমার চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়বার কথা, কারণ তার পা দুটো ভেঙে আসবে। কিন্তু ও হরি, তার সঙ্গী ওখানে টুপি রেখেছে যে। আনমনা হয়ে বসতে হবে; ওটা সরিয়ে দিয়ে বসা তো চলবে না। তা হলে সবটা দৃশ্য মাটি হয়ে যাবে। উৎকণ্ঠায় নাট্যকারের হাত-পা ঘেমে উঠল। সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না ওই সর্বনাশা টুপিটাকে ছাড়া। ওই সর্বনাশা মুহূর্ত যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। এসে পড়ল যে ওই মূর্ছিতের মতো চেয়ারে ঢলে পড়বার মুহূর্ত। এখন কি করা যায়? এখন যদি বাইরে সাইরেন বাজতো! যদি নূতন করে ছোরা মারামারি লেগে যেতো। কোনরকমে ঘরে একটা গোলমাল লেগে যেতো যদি, উপস্থিত তা হলে মান বাঁচত? কি করব! কি আমি করব? "আগুন আগুন" বলে চেঁচাব?

এই এলো, এই এলো সেই মুহূর্ত। বিদ্যুতের বেগে, এই এলো। এই এক্ষুণি উমা এই আপদ টুপিটার উপর ভেঙে পড়বে–এই, এই–নাঃ, ঈশ্বরই উমাকে বুদ্ধি জুগিয়েছে। আত্মসচেতন উমা বেমালুম টুপিখানা হাত দিয়ে তুলে নিল তারপর–মাত্র তারপর সে মুর্ছা খেয়ে চেয়ারে ভেঙে পড়ল। টুপিটা তখনো তার হাতে। কিন্তু এটাকে দিয়ে উমা করবে কি? দৃশ্যের শেষ পর্যন্ত কি ওটাকে সে হাতে নিয়েই থাকবে না কি? টেবিলে রেখে দিলেও তো পারত। অবশেষে তাই করল মুর্ছিতাবস্থাতেই টুপিটা টেবিলে রাখল। কি ভয়ানক ব্যাপার। নাট্যকার দর্শকদের দিকে চোখ দিয়ে তাকাল। যা, টুপির পর্বটা দেখছি সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়েছে। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল তার। মঞ্চের দিকে তাকালো। কই সংলাপ তো একটুও এগুচ্ছে না। ওই 'ভাব' দেখাতেই যে সময় কাবার হয়ে যাবে। সত্যি এ বড় একঘেয়ে লাগছে–এভাবে সময় নষ্ট করা।–এটা আমার কেটে দেওয়া উচিত ছিল। এটা বড় দুর্বল, একঘেয়ে আর বড্ড খারাপ। এখানটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে নিলে ভাল করত। তা করছে কই? কি করা যায়? উঠে চেঁচিয়ে বলা যায়, "থামো, থামো, এটা আমি কেটে বাদ দিচ্ছি।"

শেষ পর্যন্ত ওটা শেষ হল–এই নির্বাক ভয়ানক অবস্থাটা। এখন নায়ক-নায়িকার সংলাপের দ্বারা আত্মবিকাশের স্থানটা এসে পড়ল। এটা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান–সারাটা দৃশ্যের এটা চাবি-কাঠি। তিন পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত মিঠে-কড়া সংলাপ। ভয়ে ও উত্তেজনায় নাট্যকারের দেহ কুঁকড়ে যেতে চাইছে। সুনয়নী হুমড়ি খেয়ে মঞ্চে ঢুকল। তার মঞ্চে প্রবেশের কথা ছিল পাঁচ মিনিট পরে–সংলাপ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে। হা ভগবান! এখন কি হবে। "পরদা ফেল, পরদা ফেল" বলে নাট্যকার চিল্লাতে গেল, কিন্তু স্বর বেরুলো না, গলা তার ভয়োত্তেজনায় আটকে গিয়েছে। মঞ্চে যে দুজন রয়েছে তারাও বোবার মতো দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলছে না। এদিকে সুনয়নী তার পার্ট বলতে শুরু করেছে যে। আগের দুজন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বসে পড়ল।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী ৫৮
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী সংলাপের হল সমাধি। সমগ্র দৃশ্যের চাবিকাঠি ধূলোয় গড়াচ্ছে। যা হয়েছে, তাতে, নাটকের কিছুই দর্শকরা বুঝতে পারবে না, নাটকে কি আমি বলতে চেয়েছি, লোকে তার এতটুকু জানতে পারবে না। সব উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে গেল। সব সংঘাত টুকরো হয়ে গেল। ওই তিন পৃষ্ঠা সংলাপ বাদ পড়াতে সবটা নাটক অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সুনয়নীটা কি করল। এত আগে স্টেজ ম্যানেজারই বা তাকে স্টেজে ঢুকতে দিলে কি করে? দর্শকরা নাটকের এই অসংলগ্নতায় বিরক্ত হয়ে এখনি হয়ত চাপা গুঞ্জন শুরু করে দেবে। নিতান্ত বালকেও বুঝতে পারবে, নাটকটার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই প্রযোজক কি করবে?

সে নাটক বন্ধ করে দেয় না কেন? নাট্যকার চকিতে একবার দর্শকদের দিকে তাকায়। তারা ইতিমধ্যেই কলবর শুরু করেছে কিনা, প্রতিবাদ করতে আস্তিন গুটাচ্ছে কিনা। না, তারা শান্ত আছে, তাদের কারো কারো নাক ডাকছে, কেউ কেউ কাশছে–কখনো কখনো তাদের এখানে ওখানে টুকরো হাসির ঢেউ খেলছে। বোধ হচ্ছে যেন, সুনয়নী ঠিক কাজই করেছে। দর্শকরা খুশি আছে, অঙ্কের শেষে বোধ হয় তারা শিস দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করবে। নাট্যকারের অবস্থা ঠিক ত্রিশঙ্কুর মতো হয়ে যায়, না পায় মাটি না পায় স্বর্গ। বক্স থেকে এক দৌড়ে উইং এর দিকে যায়। মঞ্চে আগুন লাগিয়ে দিলেও বুঝি তার জ্বালা জুড়োবে না। দর্শকদের সামনে সে আর কখনো মুখ দেখাতে পারবে না। একটা সাজকক্ষে ঢুকে পড়ল সে। মাথা গুঁড়ে ভাবতে লাগল। দুই হাতে মাথা চেপে ধরল।

মাথা তুললো কয়েক ঘণ্টা পর। অসহনীয় অচিন্ত্যনীয় কয়েকটা ঘণ্টা তার ভাবনার সমুদ্রে ডুবলো। তারপর সে মাথা তুললো। বাইরে কি যেন হচ্ছে। জলের যেন স্রোত বয়ে চলেছে। কল কল কুল কুল শব্দে। সে শব্দ চীৎকারে পরিণত হল। সাজ-কক্ষের দ্বারে এসে তা ধাক্কা দিল : "এইখেনে নাট্যকার বসে আছেরে, এইখেনে।" কে এসে তার হাত ধরল, টেনে চলল তাকে নিয়ে। তারপর এক তুমুল কাণ্ড। টেনে, ধাক্কা মেরে ঠেলে, উঁচু করে তুলে তাকে নিয়ে চলল। বাধা দেবার জন্য সে জোর করল, ধ্বস্তাধ্বস্তি চলল, কিন্তু পারল না। সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, চোখে কিছু দেখছে না, কানে কিছু শুনছে না, কি যে হচ্ছে, কিছুই তার ধারণায় আসছে না। জনতা টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে শেষে মঞ্চের উপর নিক্ষেপ করল। কামান থেকে যেভাবে গোলা নিক্ষেপ করা হয় ঠিক সেইভাবে। সেখানে উমা আর সুনয়নী দুদিক থেকে তার দুই হাত ধরে ফুট লাইটের দিকে টেনে আনল। নিচে জনসমুদ্র–শত শত হস্ত, শত শত চক্ষু–সব তার দিকে উদ্যত। সে একবার বোকার হাসি হাসতে চেষ্টা করল। ঘাড় নাড়ল এবং কম্পিত হস্তে জনতাকে নমস্কার করল।

পরদা পড়ল। আবার কোলাহল। এবার শত শত হাততালি। আবার উঠল পরদা। যারা চেনা লোক, তারা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল। অচেনা যারা নানারূপ ধ্বনি দ্বারা তাকে অভিনন্দিত করল। সকলের মুখে হাসি আর কোলাহল। নাট্যকারের দু চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। এইক্ষণে মনে হয়, এ রঙ্গমঞ্চের যেন সেই অভিনেতা। আবার সে অসহায় বোধ করে। বিপন্নের মতো কোনো রকমে সে এক পাশে কেটে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তেজনা থেমে এলে প্রযোজক স্বগত বলল, "যদি খারাপ কিছু না ঘটে, তা হলে নাটকের সাফল্য মারে কে?"

নাট্যকার কোনো রকমে ঘাড় তুলে বলল, " দেখুন মশাই উমা তো চেয়ারখানাতে টুপির উপরেই বসতে পারত। আমি প্রথম দৃশ্যের কথা বলছি যেখানে উমা মুর্চ্ছিত হয়ে চেয়ারের উপর ভেঙে পড়ল। দর্শকরা হয়ত টিটকারি দিয়েছে ঐ দৃশ্যে।"

"টিটকারি দেবার কিছু নেই মশাই নাট্যকার। চলুন চলুন, এগারোটা নাগাদ বসে থাকার কোনো মানে হয় না।" বলে প্রযোজক উঠে পড়েন।

বেচারা নাট্যকার অভিনেতা অভিনেত্রীদের ধন্যবাদ দিতে গেল। তারা তখন চা খাচ্ছে। নায়ক পেয়ালা মুখ থেকে সরিয়ে ধন্যবাদের উত্তরে বিনীত হেসে বলল, "বইয়ের তিন পাতা পার্ট আমরা বাদ দিয়ে অভিনয় করেছি, কারণ পেরেকে ঠেকে উমার শাড়ি গেল ছিঁড়ে আর অসময়ে ঢুকলো এসে সুনয়নী।"

সুনয়নী কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, "অত সময় ঠিক করে কেমন করে ঢুকবো, আমি কি ঘড়ি চিনি? না আমাকে ভালো মাইনে দেয়–"

উমা কেঁদেই ফেলল, "এই রকম করে শাড়ি পরায়,..... প্রথম রাতেই.....এখন আমি কি করে বাকি অভিনয় করব। আমার কি হবে ..... এ ....."

নগণ্য নাট্যকার তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়, "তাতে কি, তাতে কি–তিন পাতা সংলাপ বাদ পড়েছে, কি হয়েছে তাতে। দর্শকদের কারুর চোখেই ওটা পড়েনি।"

নাট্যকার যা ভেবেছিল। তার থেকে এখানে যা বলেছে তাই বেশি ঠিক। বাস্তবিক, প্রথম অঙ্কটার যে না হয়েছে মাথা না হয়েছে মুণ্ডু দর্শকদের কেউ তা ধরতেই পারেনি।

AMARBOI.COM

প্রথম রজনীর পর

প্রথম রজনীর পর নাট্যকার ভাবতে থাকে, তার নাটক সফল হয়েছে কি ব্যর্থ হয়েছে। কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছে না। দর্শকরা তাকে তুমুল চীৎকারে নন্দিত করেছে। কিন্তু এওতো হতে পারে তারা তাকে বোকা বানাবার জন্যই ওরকম করেছে। গভীর উৎকণ্ঠায় তার সময় কাটে। বন্ধুদের তার সম্বন্ধে কথাবার্তা যা তার কানে আসে তা এই রকম :

"তুমিতো বেশ নাট্যকার হয়েছ হে।"

"আমি যদি তুমি হতুম, প্রথম অঙ্কটার খানিকটা কেটে বাদ দিতুম।"

"অভিনয় করেছে বেড়ে, মাইরি।"

"আমার মর্মোচ্ছাসিত অভিনন্দন তোমাকে আমি জানাই বন্ধু।"

"তৃতীয় অঙ্কটা আরো খাটো করা যেত হে।"

"আমি লিখলে, শেষটা অন্য রকম হত।"

"শেষ দৃশ্যটাই হয়েছে চমৎকার।"

"দ্বিতীয় অঙ্কটা একটু একঘেয়ে লেগেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি যা লিখেছ তার জন্য তুমি সন্তুষ্ট বোধ করতে পার।"

নাট্যকার অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়, ওটা কি সার্থকি হয়েছে, না ব্যর্থ হয়েছে। সে বাজারের সরকয়টা কাগজ কিনে আনল। তারা কি লিখেছে দেখবে।

কাগজগুলো পড়ে সে যা বুঝতে পারল তা এই যে, তার নাটকে একটা আখ্যানবস্তু আছে সন্দেহ নেই, তবে আর সব যে কি হয়েছে না হয়েছে সে সম্বন্ধে সমালোচকদের নানা মুনির নানা মত। তাদের লেখা থেকে সে বুঝল যে, তার নাটক : ১. অনেকের ভালো লাগবে, ২. অনেকের ভালো লাগবে না, ৩. দর্শকদের একাংশ শিস দিয়েছে, ৪. নাট্যকারের সাফল্য অনেকের আনন্দের কারণ হয়ে থাকে।

প্রযোজক সম্বন্ধে : ১. ওর কিছু করার ছিল না, ২. যা পেরেছে করেছে, ৩. মূল বই অনুসরণ করেনি, ৪. কষ্ট করেছে যথেষ্ট।

অভিনয় সম্বন্ধে : ১. জোরালো হয়েছে, ২. মন্থর হয়েছে, ৩. উৎসাহের সঙ্গে করেছে, ৪. পাট তারা বুঝতে পারেনি, ৫. নাটকের সাফল্যের জন্য তারা অনেক খেটেছে ইত্যাদি।

কাজেই এ সব মতামত পড়ে লেখক বুঝতেই পারল না নাটক সার্থক হয়েছে কি ব্যর্থ হয়েছে।"

সাপ্তাহিক দেশ : ১৫ বর্ষ ৫ ও ৬ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ২০ ও ২৭, ১৩৫৪
তে প্রকাশিত দু সংখ্যায় ছাপা হয়। দ্রঃ পৃ. ২১২-১৫, ও ২৫৭-৬১

পাদটীকা :
এই রম্যরচনাটি অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা করেন চেক নাট্যকার কার্ল কাপেকের How a drama is produced অবলম্বনে। দেশে ছাপার সময়ে অলঙ্কৃত করা ছিল। রেখা অঙ্কনগুলো এখানে বর্জন করা হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ নামে লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন চীনা চিত্র-কলার রূপ ও রীতি

প্রাচীন চিত্রকলার আদি ও অন্ত দুই-ই রহস্যাবৃত। এর উৎস কোথায়, তা যেমন খুঁজে বার করা সহজ নয়, তেমনি কবে থেকে প্রজাপতির মত রঙিন-এর পাখাগুলো খসতে শুরু করেছিল, অন্তর্ঘাতী আত্মবিপ্লবে বিক্ষত চীনের বিশৃঙ্খল ইতিহাস খুঁজে তা বের করা দুঃসাধ্য। তবে, চীনা শিল্পে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় যে রূপই হোক, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বহুদিন থেকে তা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত তাকে জাগাবার প্রয়োজনেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে চীনা নব্য চিত্রকলার গোড়াপত্তন হয়।

এই নব্য চিত্রকলাকে বর্ণসঙ্কর আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ এর মূর্তি স্বদেশে হলেও তার অঙ্গরাগ হয়েছিল বিদেশী রূপ ও রসে। কয়েকজন চীনা যুবক ঐ সময়ে ফ্রান্সে ও বেলজিয়ামে গিয়ে সেখানকার রূপ ও পদ্ধতি শিখে এসে চীনে তা প্রবর্তিত করেন। একদল আবার জাপান থেকেও কিছু পাশ্চাত্য প্রভাব আহরণ করেন; ঐ প্রভাব জাপানে এর আগেই স্থান করে নিয়েছিল।

মোটামুটি ভাবে ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে এঁরা নানা নব্য ভাবধারায় চীনা শিল্পকে রূপায়িত ও রসায়িত করেন। এঁদের মধ্যে হোয়ান-চুন-পি, ফাঙ শিউন কিণ, শিয়া ও-তিন, কুয়ান-শান-ইয়ে, চ্যাঙ তা-চিয়েন ও শজুপিও'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত জনকে নব্য চীনের শিল্পাচার্য বলা যেতে পারে। শিল্পচর্চা তাঁর অন্যতম লক্ষ্য হলেও তাঁর জীবনের মুখ্য ব্রত হচ্ছে শিল্প শেখানো। তাঁর আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পাশ্চাত্য প্রভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও চীনা শিল্পের প্রাচীন রীতি পদ্ধতিকেই অবলম্বন করেছেন। শিল্পের বর্ণসঙ্করত্ব তাঁর অভিপ্রেত নয়।

বিজ্ঞানের যুগে পৃথিবী এক হিসেবে তার বিশালত্ব হারিয়েছে। তেমনি বড়ো দেশগুলি তাদের বৈশিষ্ট্য খোয়াতে বসেছে। এ যুগ দূরকে করেছে নিকট আর পরকে করেছে ভাই। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতিতে এখন আর রক্ষণশীল বলে কিছু নেই। একটা বর্ণসঙ্কর ভাবধারা অনিবার্যভাবেই সব কিছুকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো দেশের কতকগুলো মৌলিকতা আজও অক্ষুণ্ন আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। গ্রীক দর্শনে খাদ মেলাবে কে? ভারতের উপনিষদের ঋষিরা যা দিয়ে গিয়েছেন, তাতে মিশ্রণ ঘটাবে কোন্ দেশের ভাবধারা? এদেরই মতো চীনের প্রাচীন চিত্রকলাও এমনি একটা জিনিস, যাতে কোনো কিছু মেশাবার যোগ্যতা কারো হতে পারে না। এর গড়ে ওঠার ইতিহাস আলোচনা করলেই একথার প্রমাণ হবে। প্রাচীন শিল্প-সম্পদ সব দেশেরই আছে; কিন্তু চীনের সঙ্গে তাদের কারো তুলনা হয় না, কেন না, আর সব দেশেই লিখন-রীতি ও চিত্রণ-রীতি দু'টি আলাদা বস্তু, কিন্তু চীনে লিখন-রীতির মূলটাই চিত্রণরীতি। সেখানে অক্ষরগুলো চিত্র আর কথাগুলো চিত্রসমষ্টি। লেখার কাজ কলম দিয়ে হত না, হত তুলি দিয়ে। যাকে কিছু লিখতে হত, তাকে বস্তুত চিত্রকার্যই করতে হত। এজন্য সেখানে চিত্রকলা হয়েছে সাহিত্যের বাহন। পদ্ধতিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদিম এবং অসুবিধাজনক হলেও, এতে চিত্রকলা মানুষের কাছে অসীম মর্যাদা পেয়েছে। যুগযুগান্তের সাহিত্যসেবীদের এই অপরিহার্য শিল্প-সাধনার মধ্য দিয়ে চীনের চিত্রকলা একটা সুমহান রূপ পেয়েছে। জীবনকে ব্যাখ্যা করা যদি শিল্পের কাজ হয়, তবে সেখানে শিল্প পেয়েছে চরম সার্থকতা। আর প্রকৃতিকে রূপ দেওয়া যদি সার্থকতা হয়, তবে প্রাচীন চীনা শিল্প তুলনাহীন। ইয়াংসি নদী যেমন শতাব্দীর পর শতাব্দী নীরবে বয়ে চলেছে, তাতে ভাঙন নেই, স্রোতের প্রখর বেগ নেই, কূল-ভাঙ্গানে ঢেউও নেই, অথচ চলার তার বিরামও নেই, তেমনি নীরবে বয়ে এসেছিল প্রাচীন চীনে নিরবচ্ছিন্ন প্রাণধারা। এরই সীমাহীন প্রশান্তি, শান্ত মৌন মন্থরতা, জ্ঞান-গম্ভীর নীরবতা এবং অবিরাম গতিশীলতা প্রতি যুগের চীনা শিল্পে ধরা দিয়েছে। আর প্রকৃতির সঙ্গে এর যোগাযোগের কথা বলতে গেলে, বলে শেষ করা যাবে না।

চীনের একটি প্রবচনে আছে 'দূরের মানুষের চোখ নেই, দূরের গাছে পাতা নেই, দূরের পাহাড়ে পাথর নেই, দূরের জলে ঢেউ নেই।' মানুষই হোক আর প্রকৃতিই হোক একান্ত কাছে এসে না দেখলে তাকে ঠিক ঠিক দেখা হয় না। প্রাচীন চীনা শিল্প মানুষকে বুকে জড়িয়ে আর প্রকৃতিতে মগ্নচৈতন্য হয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। চীনা শিল্পীরা প্রকৃতিকে যেভাবে দেখেছেন, সেইভাবে চিত্রিত করেছেন। বুদ্ধি দিয়ে তার অপ্রাকৃত সত্তাকে কোথাও ক্ষুণ্ন করেন নি। এজন্য তাদের যদি আমরা বুঝতে চাই, তাহলে বুদ্ধি দিয়ে পারব না, চোখ দিয়েই পারব শুধু। এখানে শাণিত বিশ্লেষণী বুদ্ধি চলবে না। আর্টের 'থিয়োরী' গুলিও ভুলে যেতে হবে; এঁরা যেমন বিচার বিতর্ক ভুলে কেবল মুক্ত প্রকৃতিকে সামনে রেখে এঁকে গিয়েছেন, তেমনি একে উপলব্ধিও করতে হবে কেবল দৃষ্টি দিয়ে।

এ শিল্পের আর এক বৈশিষ্ট্য পটভূমির ব্যাপকতা। এক একটা চিত্রে প্রকৃতি বহু যোজন বিস্তৃত। মানুষ কীট পতঙ্গের মতো ছোট হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতির রূপ রসে সে প্রায় আত্মবিলীন। জ্ঞানগম্ভীর মৌনতা নিয়ে সে প্রকৃতির কোলে স্তব্ধ। তার প্রকৃতিতে ঝটিকা নেই, তার অন্তরেও উপল-ভাঙা চাঞ্চল্য নেই, তার নদীতে নৌকা ডোবে না। নিস্তরঙ্গ জলে নিরবিচ্ছিন্ন মন্দ স্রোতে নৌকা রেখে সে ছিপ ফেলে। চোখের দৃষ্টি তার স্তিমিত। কেন এ স্তিমিত ভাব? কন্‌ফুসিয়াস, লাউৎসে প্রমুখ ঋষিরা যে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে গিয়েছেন, তারই অন্তরপ্লাবী আলোয় তার দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে গেছে। এ তারই প্রশান্তি। দীর্ঘ, পত্রমর্মরিত দেবদারুশ্রেণী, শাখায় উপবিষ্ট পক্ষিশাবক, ধ্যানগম্ভীর শৈলমালা, যোজনব্যাপী প্রান্তর সবকিছুতেই একটা অচঞ্চল অবিচলিত ভাব–অথচ কোনোটাই নিষ্প্রাণ নয়। যে প্রাণের গতি মন্থর, কিন্তু যাত্রা বিরতিহীন। সৃষ্টির আদি যুগ আর প্রলয়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন এই প্রাণধারা বয়ে চলবে। পুড়িয়ে দিয়ে ফুরিয়ে দেবার কোনো লক্ষণ এখানে নেই। ভাঙা-গড়ার মত্ততা এখানে অচল। জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাচীন চীনের এই ছিল প্রকৃত রূপ। যে যুগের শিল্পীরা এই রূপকেই দুহাতে লুটে নিয়েছিল। তারা যেন ডেকে বলছে : 'শুণ্বন্তু বিশ্বে–', শিল্পীকে 'লজিকে'র পাঁচিল-দেওয়া কোঠাঘরে আবদ্ধ করো না। সে যেমন সহজে বেরিয়েছে, তেমনি তাকে সহজেই তোমার অন্তরে ঢুকতে দাও, প্রকৃতি এখানে অবিকৃত। তাকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ কর, তাকে বিশ্লেষণ করে ক্ষুন্ন করতে যেয়ো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পরসিকদের মতে, চিত্রকলার দিক দিয়ে চীনকে একমাত্র ইতালির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য শিল্পকলায় ইতালির যে স্থান, প্রাচ্য শিল্পে সে-ই স্থান চীনের।

চীনা শিল্পের প্রাচীনতার পরিমাপ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটুকু জানা গিয়েছে যে, 'খ্রিস্ট জন্মের তিনশ' বছর আগে তুলির প্রচলন ছিল। লিখন ও চিত্রণ দুই কাজেই ছিল এই তুলির ব্যবহার। তখন থেকেই চীনারা এ কাজে সুদক্ষ। তখন রেশমি বস্ত্রে ছবি আঁকা হতো। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সেখানে কাগজের প্রচলন হল। তার আগে কাঠের তক্তায় বা বিষয়বস্তু দীর্ঘ হলে দেওয়ালের গায়ে চুন দিয়ে এঁকে রাখা হত চিত্র। সে সব চিত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ঐসব 'ম্যুরাল' (প্রাচীর চিত্র) কারুকার্যে প্রধানত ইতিহাসের ঘটনা আর মানুষের মূর্তি চিত্রিত হতো। ঋষি কন্‌ফুসিয়াস এই রীতির খুব অনুরক্ত ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার অনেক আগে প্রকৃতির প্রাণবত্তা ও শক্তিধারার প্রতীকরূপে বাঘ ও ড্রাগনকে গ্রহণ করা হয়েছিল–চিত্রকলায় এ দুটির ছিল খুব প্রাধান্য। ঋষি লাউৎসের মরমী ভাবধারণা, তার শিষ্যগণের কথা ও কাহিনী তখন শিল্পীর কল্পনাপ্রবণ মনে শিল্পের উপজীব্য হয়ে ধরা দিয়েছিল। তারপর বুদ্ধের সৌম্যমূর্তি, অনন্তের পথে তার বিরামহীন ধীরগতি যাত্রা চিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু তখনো বুদ্ধ ও লাউৎসের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য করা হত না। সৌম্য, শান্ত বুদ্ধ-মূর্তিকে অনেক সময় তারা প্রজ্ঞাবান লাউৎসের মতোই ঋষি বানিয়ে ফেলত।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রকৃতি-খণ্ডের (প্রাকৃতিক দৃশ্যের–landscape) চিত্র আঁকা শুরু হয়। তখন থেকে শিল্পীরা নিজ নিজ নামে খ্যাতিমান হতে থাকেন। কো-কাই-চীন নামে একজন শিল্পী চতুর্থ শতাব্দীতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁর 'প্রসাধন' শীর্ষক ছবিখানা বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। তাও বংশধারার (৬১৮–৯০৭ খৃ) অন্তর্গত যু-তাউৎজু ছিলেন সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। 'শাক্যমুনি' নামক ছবিখানা তাঁর অঙ্কিত বলেই এতকাল প্রসিদ্ধ ছিল। এখন গবেষকরা বলছেন, তাঁর অনেক আগেই কোনো শিল্পী চিত্রখানি এঁকেছিলেন। 'ওয়াঙ-চুয়াঙ-এর দৃশ্য' শীর্ষক ছবিটি অষ্টম শতাব্দীতে আঁকা। 'ইউয়েন' বংশধারার চাও মেঙ-ফু এছবির শিল্পী। শিল্পী ওয়াঙ-ওয়ে নদীর পাড়ে বাড়ি তৈরি করে তার এক ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবি অবলম্বন করে এটি আঁকা। চীনা শিল্পে প্রকৃতি খণ্ডকে রূপ দেবার এবং চীনা সুলভ শান্তি ও সৌম্যভাবে ফুটিয়ে তুলবার সম্ভবত এই প্রথম চেষ্টা। এ হিসেবে এই ছবিটির খুব গুরুত্ব আছে। পরবর্তীকালের শিল্পীরাও প্রকৃতি খণ্ড আঁকার বেলায় এই রীতি অনুসরণ করেছেন। শিল্পী ওয়াঙ ওয়ের কবি হিসেবেও প্রসিদ্ধি ছিল। চিত্রে ভাবালুতা, বর্ণ মাধুরীর চমক, দূরবর্তী পাহাড় ও দিকচক্রবালের মায়াময় হাতছানি তাঁর চিত্রেই প্রথম ধরা দিয়েছিল। তাঁর আঁকা ছবি একখণ্ড গীতি কবিতার মতো অন্তরস্পর্শী।

এরপর বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন শিল্পী বংশধারায় আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা সবাই নতুন নতুন ধারণা ও রূপ সৃষ্টি করে চীনের শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। এদের মধ্যে সুঙ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৯৬০-১২৭৯ খৃ). ও মিঙ বংশধারার কোন অজ্ঞাত শিল্পীর ছিপ দিয়ে 'মাছ ধরা' বিখ্যাত ছবি।

চীন সম্রাটগণ চিত্রশিল্পের খুব বড়ো উৎসাহদাতা ছিলেন। এ সম্পর্কে সম্রাট নিঙ-সুয়াঙ এবং পেন-ৎসুয়াঙ-এর নাম পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত সম্রাট 'বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ অভিমুখে যাত্রা' শীর্ষক ছবির শিল্পী লিঙ-তাই (১২০০ খৃ.) এর উৎসাহদাতা ছিলেন। বুদ্ধকে ঋষির বেশে চিহ্নিত করার রেওয়াজ তখনো ছিল। 'প্রকৃতির কোলে প্যাগোডা' চিত্রের শিল্পী কুও হ্সি (১০২০–১০৯০) সম্রাট শেন-ৎসুয়াঙ-এর অধীন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। প্রকৃতিখণ্ডের রূপায়ণে এক ছন্দায়িত 'মিষ্টিক' ভাব, হালকা কুয়াশার একটা বর্ণমধুর ব্যঞ্জনা ও চমক জাগিয়ে তোলার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল।

'অর্কিড ও বাঁশবন' শীর্ষক ছবিটার দিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে। এর মধ্যে তুলির যে জোরালো টান পড়েছে, তাতে শিল্পী শিহ্-তও-এর (১৬৬০–১৭১০ খৃ.) একটা নিজস্ব ধারণা ও ভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। মনে হয়, আগেকার 'মিষ্টিক' শিল্পধারণাকে তিনি যেন সবলে ছিন্ন করতে চেয়েছেন। বস্তুত তাঁর থেকেই প্রকৃতিখণ্ড আঁকার রীতিকে প্রাচীন শিল্পীদের প্রভাবমুক্ত হওয়ার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

চীনা শিল্পের চরমোৎকর্ষ প্রায় তেরোশ বছরের পুরোনো। চীনা শিল্পীরা রঙের চেয়ে রেখার চমক লাগানোরই বেশি পক্ষপাতী ছিলেন বলে মনে হয়। তবে যখনই তারা রঙ ব্যবহার করেছেন, সব সেরা সোনালী রঙকে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশেষ করে বৌদ্ধ যুগের চিত্রে রঙের চাতুর্য বেশি দেখানো হয়েছে। প্রকৃতিখণ্ড আঁকতে তাঁরা রেখাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তাঁদের চিত্রে তথ্য বা ঘটনার স্থানগুলি মুখ্যত তাঁরা চিত্রে এক-একটা অলিখিত খণ্ড কবিতাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। কখনো আবার রচিত কবিতা পুরোপুরিভাবেই ছবিতে ছড়িয়ে নিয়েছেন।

চীনের একটা পুরোনো প্রবচনে বলা হয়েছে–'ছবি জিনিসটা একটা নির্বাক কবিতা মাত্র।' একথা চীনের চিত্রকলা সম্বন্ধে খুব সত্য। যশস্বী শিল্পীদের অনেকেরই কবি খ্যাতিও যথেষ্ট ছিল। তাঁরা মনের অঙ্কিত কাব্যবস্তুকে ইচ্ছামতো কখনো লেখায়, কখনো চিত্রে রূপ দিতেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের সমান কৃতিত্ব প্রকাশ পেতো। তাঁদের সৃষ্টি আঙ্গিকের দিক থেকে দুই বস্তু হলেও, ভাবনার দিক থেকে ছিল একেবারে অভিন্ন।

আনন্দবাজার পত্রিকা : মে ২৯, ১৯৪৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটদের ছবি আঁকা

শিশুটি আপন মনে কত কি বকে গেল, তার এক বর্ণও বুঝলাম না। কী বা সুর। না আছে খাদ, না আছে নিখাদ। আবোল তাবোল কথাগুলো তারই ছকে ফেলে এক দুপুর বসে বসে গাইল; শেষে আপনি এক সময় গান বন্ধ করে উঠে গেল। তারপর, কি বা ছবির ছিরি। মাথা নাই মুণ্ডু নাই তার। নখ দিয়ে মাটির উপর তাই বসে বসে আঁকল। চেয়ে চেয়ে দেখল। তারপর মুছে ফেলে উঠে গেল। রইল না কোনো চিহ্ন।

তার কথা বুঝলাম না, সুর বুঝলাম না, আঁকিবুকি গুলোও বুঝলাম না। কিন্তু ভাল কি লাগছে না একটুও? জোর করে বলতে পারি কি যে, একেবারেই একেঘেয়ে, বিরক্তিকর লেগেছে? ভগবান তাকে শিশু করেছেন বলেই, তার ভেতরে যে সম্পদ দিয়েছেন তাও শিশু। তাই তার আয়োজিত আনন্দের পশরা বয়স্কের নিকট অকিঞ্চিৎকর? কিন্তু ভাল-লাগার ঋদ্ধিটুকু দিয়ে তাকে গৌরবান্বিত করতে সৃষ্টিকর্তার ভুল হয়নি।

সে যতদিন শিশু থাকে, প্রকৃতির সঙ্গে থাকে তার নিবিড় যোগাযোগ। বুদ্ধি পেকে ওঠেনি বলেই সে শিশু। কাজেই কোন কিছু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা তার থাকে না। প্রকৃতি নিজে শিল্পময়ী। তার মধ্যে অনন্তকালের অফুরন্ত শিল্পের স্রোত বয়ে চলেছে। শিশু তারই সান্নিধ্যের বস্তু; কাজেই তাকেও শিল্পের পরশ দিয়ে প্রকৃতি নিজের আনন্দবোধ কতকটা চরিতার্থ করে নেয়। শিশু যে আপন মনে কথা বলে, সৃষ্টিছাড়া সুরে অর্থহীন শব্দ যোজনা করে গান করে, দেয়ালে মাটিতে সেলেটে অর্থহীন আঁকিবুকি করে, তাতে তার সেই শিল্প প্রেরণারই উপচানো রস খানিকটা মোক্ষণ হয় মাত্র। তাই তাতে অর্থ না থাকলেও, সামঞ্জস্য বা সৌষ্ঠব না থাকলেও ভালই লাগে; কেননা শিশু যে আনন্দময়। শিল্প অর্থই আনন্দ। আনন্দ অর্থই রস। আবার রসেই জীবন।

জীবনে বুদ্ধি যখন পরিপক্ক হয়, তখন আমরা যে শিল্প রচনা করি, তা দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাই, নিজে খুশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো পাঁচজনকে খুশি করতে চাই। পাঁচজনের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে সেই শিল্পের উৎস ক্রমে বেড়েই চলে। বারোয়ারি কারবারে আমাদের শিল্পের হয় বেচাকেনা এবং বিস্তৃতিসাধন। শিশুর ব্যাপার ঠিক উল্‌টো। যেই দেখল, আর কেউ তার শিল্পের সুর কান পেতে শুনছে বা তার রূপ চোখ পেতে দেখছে, অমনি তার সহজ ধারাটি যাবে স্তব্ধ হয়ে, উৎসটি যাবে রুদ্ধ হয়ে। এর কারণ, অন্যকে খুশি করার তাগিদ তার মধ্যে আসেনি; সে খুশি তার নিজের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ। নিজের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে মশগুল হয়েই তার শিল্পরচনা। সে তখন মন-সর্বস্ব। অজানা মুলুকের এক রঙিন প্রজাপতির পাখায় ভর করে সে-মন তার ঘুরে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়। বুদ্ধির সেখানে এখনো পাখা গজায় নি।

বুদ্ধির পাখা যেদিন গজাবে, সেদিন তার মনে ইম্‌প্রেশনের (impression) জায়গায় বিশ্লেষণ এসে ছড়ি হাতে জেঁকে বসবে। বলবে এটা হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে; এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো নয়, সে ভালো। বিশেষজ্ঞদের মতে, তার এ বয়সটা আরম্ভ হয় বারো তেরো বছরের পর থেকে। দুই কিংবা তিন বছর থেকে তেরো বছরে আগে সময়টাই মোটামুটিভাবে সে থাকে মন-সর্বস্ব। এই সময়টাতেই তার 'ইম্‌প্রেশন' থাকে সজীব। ইম্‌প্রেশন বলতে এখানে বুঝতে হবে–যখন সে বস্তু দেখে চেনে, কিন্তু বিশ্লেষণ করে না, চোখকে আকৃষ্ট করে যে বস্তু, তাই প্রধান হয়ে ওঠে। মন জুড়ে থাকে কৌতুহল, চোখ জুড়ে থাকে বিস্ময়। কিন্তু বিশ্লেষণের বুদ্ধি মনের কোনে দানা বাঁধে নি তখনো! শিল্পের সংজ্ঞায় এইটেই শৈশবকাল। এই সময়ে শিশুচিত্তে শিল্পের যে অঙ্কুর জাগে, তাকে অনুকূল আবেষ্টনীর মধ্যে রেখে, দেখিয়ে শুনিয়ে এবং প্রয়োজন হলে শিখিয়ে পড়িয়ে, বাড়িতে শিক্ষিত হলে, শেষে তা শাখাপল্লবে সম্প্রসারিত করতে পারে। দেশের শিল্পশিক্ষকেরা যদি এই সময়টাতে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে শিশুদের মনে প্রেরণা ও পারিপার্শ্বিকের সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন তো ছবি আঁকাতে তারা পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু শিশুদের যাঁরা ছবি আঁকা শেখাবেন, তাঁদেরকে মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে শিশু হয়ে যেতে হবে। বয়সের দরুণ তাঁদের বুদ্ধি পেকেছে এ বোধ তাঁদের সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে।

শিল্পের ক্ষেত্রে বস্তুত, শিশুমনই ক্রীড়াক্ষেত্র। তাই দেখা গেছে, শিল্পীরা প্রায় সবাই খেয়ালী। তাদের বয়স যাই হোক না কেন, তাদের আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক শিশুর মত। এতেই প্রমাণ করে, মানুষের মনে এক চিরন্তন শিশু রয়েছে। সে সর্বদাই অর্থহীন খেয়ালে মগ্ন। আমাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহ বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে; পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে আর বাড়ে অভিজ্ঞতা। এসব যতই বাড়ে, ততই যেন আমরা প্রকৃতির স্পর্শ থেকে আলগা হয়ে পড়ি। কিন্তু তার সঙ্গে যোগ যে আমাদের নাড়ির, চিরন্তনের। সেইজন্যই আমরা সব সময়ের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে বুদ্ধিমান থাকি না। মাঝে মাঝে বুদ্ধির রাশ আপনা থেকে কিছুটা সময়ের জন্য আল্‌গা হয়ে পড়ে। তখন আমরা যে কে সেই–অর্থাৎ শিশু হয়ে যাই। শ্রোতা কাছে না থাকলেও কথা কয়ে উঠি। অকারণ হেসে উঠি। নির্জন প্রান্তরে পথ চলতে হঠাৎ গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠি। অথচ লোকের সঙ্গে যখন কথা কই, সেটা মেজেঘষে কৃত্রিমতা মিশিয়ে; লোকের সামনে যখন হাসি, সেটা ওজন করে। আর লোকের সামনে যখন সুরে বা শিল্পে নিজেকে প্রকাশ করি, সেটা সতর্কতার শেকলে জড়িয়ে। তাই সে প্রকাশ সহজের নয়। কিন্তু সহজ প্রকাশের মানেই শিশুর প্রকাশ।

শিল্প প্রকাশের প্রধান তিনটি ধারা। এই তিন ধারায় প্রবাহিত শিল্পকে তিনটি নাম দেওয়া যায়–কথাশিল্প, সুরশিল্প, চিত্রনশিল্প। কেবল কথায় যারা শিল্প প্রকাশ করে, এ জগতে তাদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু সংসারে এমন লোকের অন্ত নেই–যারা অন্তরের শিল্পবোধকে কেবল কথা দিয়ে প্রকাশ করে উঠতে পারে না। তাদের অন্যান্য উপায় খুঁজতে হয়। শিল্পবোধকে তারা কেউবা সুরে সুরে ছড়িয়ে দেয়, কেউ বা লাইনে, রেখায় গতিতে পরিস্ফুট করে তেলে। এই রঙে রেখায় যাদের শিল্পবোধ বিকশিত হয়, মোটামুটিভাবে বলা যায় তারাই বড় শিল্পী। কারণ তারা সমসাময়িক ও ভাবী মানবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপভোগের জন্য শিল্পের যা কিছু রচনা রেখে যায় বা রেখে গিয়েছে, মানুষের কাছে তা শাশ্বত সম্পদরূপে পরিগণিত।

আগেই জেনেছি, শিল্পের ধারা তিনটি : কথা, সুর ও চিত্রন। প্রকৃতির মধ্যে এই তিন বস্তুর বহুল বিকাশ দেখতে পাই। মানবের কথা ব্যাকরণের সূত্রে বাঁধা, সুর রাগ রাগিণীর জালে আবদ্ধ, আর চিত্রন রঙ আর তুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতিতে এই তিনটিই অবাধ। বৃক্ষের পত্রমর্মরে সেই কথা, নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে সেই কথা, বেণুবনের হাওয়ায় সেই সুর, মেঠো পথের কিনারে কিনারে, ধানগাছের দোলাতে দোলাতে সেই সুর। আর ফুলে ফুলে সেই রঙ, আকাশের মেঘে মেঘে সেই চিত্র। শিশু তো এসবেরই উত্তরাধিকারী। কাজেই তার সব কিছু আমাদের নিকট অর্থহীন মনে হবে বৈ কি? কাজেই তাকে শেখাতে গিয়ে তো অর্থ বলে শেখানো চলবে না। তার মধ্যে যা অবান্তর, তার অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে তাকেই অর্থবান মনে করে নিয়ে তাকে শিল্পের পাঠ দিতে হবে। কাজেই ছোটদের আর-সব কিছু শেখানোর চাইতে চিত্রন শেখানো অধিক দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

যাদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর তারা নিজেদের শৈশবকে একবার স্মারণ করে দেখতে পারেন। ফুলের পাপড়িতে, প্রজাপতির পাখায়, মেঘেদের গায়ে, যে নিত্য নূতন রঙের সমারোহ ঘটে, তা প্রথম যেদিন চোখে পেড়ে, সেদিনের কথা হয়ত মনে আনা যায় না। কিন্তু সেদিন যা আনন্দ হয়েছিল তা কল্পনা করতে পারি। চারপাশের প্রকৃতিদত্ত সম্ভারের নানা রূপ, নানা আকার একটা অভূত পূর্ব অনুভূতি নিয়ে সেদিনকার। শিশুমনে ধরা যে দিয়েছিল তাতে ভুল নেই। সেদিন সে শিশু আপনা থেকে শিল্পী হয়ে উঠেছিল। এভাবে সে পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সে নিজের মধ্যে অনুভর করতে পারে। এই সময়ে তাকে যে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষাও দেওয়া দরকার–এ বোধ আমাদের দেশে আগে ছিল না বললেই চলে। বিদ্যালয়ের নিচু শ্রেণিতে যে ড্রইং এর ক্লাশ হয় তাতে শিশুদের শিল্পবোধ উদ্দৃক্ত হওয়ার বিশেষ কোন সুযোগ থাকে না। কেননা, সেখানে কতকগুলি হাতিঘোড়া বা তৈজসপত্রের রেখাচিত্রকে নকল করতে দেওয়া ছাড়া আর কোনো সুষ্ঠু পদ্ধতিতেই চিত্রন শিক্ষা দেওয়া হয় না।

কাজেই তাতে শিশুর শিল্পৈষণা পরিস্ফুট হতে পারে না। আমরা যতদূর জানি, শিশুদের কোনো সুষ্ঠু পদ্ধতি ধরে শিল্প শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথের মনেই সর্বপ্রথম জাগে। এবং তিনিই এ শিক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব তাঁর বিশ্ববন্দিত বিদ্যায়তনের শিল্পীবৃন্দের উপর অর্পণ করেন। শান্তিনিকেতনের প্রায় শুরু থেকেই সেখানে ছোটদের ছবি আঁকা শেখানোর–শুধু শেখানোর নয়–শিশুর প্রকৃতিদত্ত শিল্পবোধ যাতে উপযুক্ত পরিচালনায় বিকাশলাভ করতে পারে তার সর্ববিধ সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের এই দীর্ঘকালের শিল্পচর্চার ফলে দেশে শিল্পের প্রতি অনুরাগ যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে স্বভাবশিল্পী শিশুকে অবহেলা করে আমরা যে ভুল করেছি সে ভুল ভাঙবার চেষ্টা।

শান্তিনিকেতনে শিশুদের বহু বিচিত্র পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শেখানো হয়। সেখানে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে সেখানকার শিল্পশিক্ষকেরা অতি সহজ পথে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুরূহ দায়িত্ব বহন করছেন। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার দ্বারা তাঁরা এ কাজের চমৎকার সৌকর্যসাধন করেছেন। তাঁদের এ সকল অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতির অনুকরণে অন্যত্রও যদি ছোটদের ছবি আঁকা শেখানো হয়, তা হলে উত্তম ফল যে পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে যাঁরা নিজেদের জ্ঞানকে ঝালিয়ে নিয়ে শিশুদের শিল্পশিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান, তাঁদেরকে প্রথমেই কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে তাঁদের প্রাথমিক ধারণা অবশ্যই থাকা চাই। কেবল শিল্পশিক্ষা নয়, রবীন্দ্রনাথের সব শিক্ষারই আদর্শ হচ্ছে–সহজের সাধনা।

বেত মেরে শিক্ষা দেওয়ার নীতি সেখানে অচল। সেখানে, প্রকৃতি শিশুকে বিশ্বদৃষ্টে বিস্ময় লাগার যে মায়াকাঠি ছুঁইয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেইটিই হবে শিক্ষকের হাতের অবলম্বনীয় দণ্ড। শিশু প্রকৃতির মাধুরীতে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে আপনা থেকে শিক্ষিত হয়ে উঠবে–শিক্ষক থাকবে শুধু তাকে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য–তাকে নানা ইঙ্গিত দেখিয়ে সাফল্যের পথে চালিয়ে নেবার জন্য। যারা অঙ্কন শেখাবেন তাঁদের কাজও এই হবে। অবশ্য শিশু যখন আর শিশু থাকবে না, সে যখন তেরো চৌদ্দ বছর পেরিয়ে যাবে, তার মধ্যে 'ইম্‌প্রেশন' ছাড়িয়ে যখন বিশ্লেষণ বুদ্ধি দেখা দেবে, তখন তার জন্য শেখাবার পদ্ধতিরও হবে কিছু কিছু পরিবর্তন। কিন্তু শিশুকে শেখাতে হলে শিক্ষককেও শিশু হতে হবে, এইটে ভুললে চলবে না।

অধুনা দেশের শিক্ষারীতির পরিবর্তন হতে চলেছে এবং আরো হবে। শিক্ষাকে এখন গ্রন্থ মুখস্থ করানোর মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। শিক্ষা বলতে এখন আত্মবিকাশ বলে মেনে নিতে হবে। সে বিকাশ তিক্ততার মধ্যে, জটিলতার মধ্যে, অনিচ্ছার মধ্যে হতে পারে না।

শিক্ষককে শিশুর মনের খবর জানতে হবে। সহানুভূতি ও সমবেদনার আলোকে তার মনের তলদেশটুকু পর্যন্ত দেখে নেবার ক্ষমতা শিক্ষকের থাকা চাই। শিশুমনের শিল্প-লতা বার বার মাথা তুলতে গিয়ে হয়ত এলিয়ে পড়বে। শিক্ষকের কর্তব্য হবে তাকে ঠিক জায়গাটিতে বাহিয়ে দেওয়া–যেখানে থেকে সে নৈরাশ্যের বাতাসে এলিয়ে পড়বে না কিংবা অত্যুৎসাহের উত্তাপে তার কিশলয়গুলি শুকিয়ে মিইয়ে আসবে না। তার কাছে নানারকমের রঙ থাকবে; থাকবে আঁকবার যাবতীয় উপকরণ। রঙের প্রাচুর্য নিকটে থাকলে তবেই সে প্রকৃতির সদাপরিবর্তনশীল চিরনূতন রূপ থেকে আহরণ করে তাকে তুলির সাহায্যে ব্যঞ্জনা দিতে সক্ষম হবে।

তার আঁকা ছবিকে পাকা মন দিয়ে দেখলে চলবে না। তা হলে তার মধ্যে হাজারো ত্রুটি চোখে পড়বে। দেখতে হবে তারই সমবয়সী চোখ নিয়ে। বড়দের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা তুলনীয় হতে পারে না কিছুতেই। তার শিল্পকে তারই অভিজ্ঞতার মাপকাঠি নিয়ে যাচাই করতে হবে।

ছোটদের আঁকা ছবিতে বয়স্কজনোচিত পরিবেশ ও আঙ্গিক সৌষ্ঠব আশা করা বাতুলতা। তার মনের মধ্যে যে শাশ্বত প্রেরণা রয়েছে, সেটাই আত্মপ্রকাশের জন্য সর্বদা চেষ্টাপরায়ণ। তার প্রকাশের পথ করে দেওয়া এবং সে পথ নির্মুক্ত করে দেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেই যথেষ্ট করা হল। তারপর সেই প্রেরণা শিল্পের খাতে আপনাআপনি বেরিয়ে আসবে, আপনাআপনি রূপ নেবে এবং সে-রূপ আপনি রসে অবগাহন করে উঠবে। এতে সফলকাম হতে হলে মোটামুটি কি কি উপায় অবলম্বনীয়, বিশেষজ্ঞদের জবানিতে তা একানে উদ্ধৃত করছি। শিক্ষককে সর্বপ্রযত্নে শিশুর আত্মপ্রকাশের যাবতীয় সুযোগ দিতে হবে।

কাগজ, তুলি, খড়ি, জলরঙ, তেল রঙ যথেষ্ট পরিমাণে তাকে দিতে কার্পণ্য করলে চলবে না। তার মন যখনই যেমনটি চায়, তখনই তেমনটি যেন সে কাজে লাগাতে পারে। এতে অভিভাবকের ভয় পাবার কিছু নেই। কেননা, এসব কিনে দিতে খরচা তেমন কিছু বেশি পড়বে না। যারা শিশুর খাওয়া-পরা জুগিয়ে আসছেন, তারা এ খরচাটুকুও অল্পায়াসে জোগাতে পারবেন। শিশু শিল্পীটির আবেষ্টনী হওয়া চাই শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেটি শিল্প-বিরোধী হলে চলবে না। সেখানে প্রকৃতিদেবীর অনুপস্থিতি না থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিল্পী যেন প্রকৃতির অন্তরের স্পর্শ সর্বদাই পায়, তার চিরনূতন রূপ থেকে সে যাতে নূতন নূতন ইম্প্রেশন আহরণ করতে পারে।

শিশু নিজে যেটুকু অভিজ্ঞতা পেয়েছে; কেবলমাত্র তারই আলোকে ছবি আঁকতে শিক্ষক তাকে বলে দেবেন এবং যদি দেখেন সেই অভিজ্ঞতার অনুপাতে বস্তুটুকু বেশ পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে তবে তাতেই তাকে তুষ্ট থাকতে হবে। এরই মধ্যে থেকে সময় সময় এমন প্রাণপূর্ণ রূপে বেরিয়ে যাবে যা দেখে শিক্ষক নিজে খুশি না হয়ে পারবেন না।

শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন, তার ড্রইংগুলি যাতে বর্ণিতব্য রেখাগুলি পরিষ্কার রূপ পায়। তবে কথায় কথায়, ভাল হয়নি, খারাপ লাগছে বলে তাকে নিরুৎসাহ করাও চলবে না। কেবল তার অঙ্কনগুলিতে ছোটখাট ত্রুটিগুলি শুধরে দেওয়া যেতে পারে। যতদূর সম্ভব সুন্দর ভাবে শিশু যাতে তার নিজের শিল্পচেতনাকে প্রকাশ করতে পারে তাতে সাহায্য করাই শিক্ষকের মুখ্য কাজ।

তারপর শিশু যখন শিল্পে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে, তখন কি করে তার শিল্পচেতনাকে অব্যাহত রাখতে হবে, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হচ্ছে–তাদের ছবিগুলি নিয়ে সময় সময় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। তাদের লিনো-কাট ও উডকাটের প্রিন্ট তুলে নিয়ে এলবাম তৈরি করা। তাদের নিজেদের ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্র থাকবে–তাতে ছবি এঁকে দেবার জন্য তাদের উৎসাহিত করা।

শান্তিনিকেতনে এ সকল দিকে দৃষ্টি রেখেই ছোটদের ছবি আঁকা শেখানো এবং তাদের উৎসাহ বাড়ানো হয়। সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের আঁকা বহু ছবি কলাভবন মিউজিয়মে স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে, যার থেকে পরবর্তী শিশুরাও উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে থাকে।

কোনো অভিভাবক এখানে প্রশ্ন তুলতে পারেন, আমরা শিশুদের যে ছবি আঁকা শেখাব, তা কেন শেখাব? সব লোক আর্টিস্ট হয়ে গেলে তারা কে কার অন্ন যোগাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য আর্ট শিক্ষা দিলেই যে তারা সকলেই বিশেষজ্ঞ আর্টিস্ট হয়ে উঠবে তার কোনো মানে নেই। তবে তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ যদি ভবিষ্যতে ভাল আর্টিস্ট হয়ে বেরিয়ে আসে সে তো হবে আনন্দেরই কথা। তার জন্য বরং তার পিতামাতার ও শিক্ষকের গৌরবান্বিত হবারই কথা। আর যারা তা হল না, তারাও আমোদের সঙ্গে, তৃপ্তির সঙ্গে, প্রকৃতিদত্ত অনুভূতির সঙ্গে একটা সুকুমার কলা সম্বন্ধে যতটুকু সম্ভব অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকল, সেটাই বা কম কিসে।

শিল্প শিক্ষা যে মানুষকে মানুষ করে তোলে, তার মধ্যে রসবোধ রুচিবোধের উদ্রেক করে, তার মনন ও কামনাকে মার্জিত করে, একথা তো অস্বীকার করা যায় না। যে-শিক্ষার দ্বারা নিজের ও পরিজনের অন্নবস্ত্রের সমস্যা মেটানো যায় সে-শিক্ষার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি যে-শিক্ষার দ্বারা নিজের রুচিকে মার্জিত ও উন্নত করা যায় এবং অপরকে আনন্দদান করা যায় সে-শিক্ষারও তো প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বিশেষত প্রকৃতি যে জিনিস আপন হাতে শিশুর মনে ছড়িয়ে দিয়েছে, আমরা অভিভাবকেরা তাকে সে জিনিস কেন কুড়িয়ে নিতে সাহায্য করব না।

যেসকল শিশুশিল্পীর 'উড্‌কাট ও লিনোকাট প্রিন্টগুলি শান্তিনিকেতন পাঠভবনের শিল্প-শিক্ষক শ্রী যদুপাত বসু ও শ্রীমতী অমলাবসুর ছাত্রদের ধারা অঙ্কিত এবং বিশ্বভারতী কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত' হয়–তাঁরা হলেন, ১. দেবজ্যোতি নেপালী বয়স ১০ বৎসর। ২. অতীন্দ্র দত্ত ১০ বৎসর। ৩. সুপ্রবুদ্ধ সেন ১০ বৎসর। ৪. দিলীপ বসু ১২। ৫. প্রেমনাথ ১০। ৬. কমলেন্দু মুখোপাধ্যায় ১২। ৭. আভাস সেন ১২। ৮. ভক্তপদ নেপালী ১১। ৯. নবমুখার্জী ১১। ১০. বালাবসু ১১। ১১. অরূপগুহ ঠাকুরতা ১২। ১২. সুজিত রায় ১১। ১৩. আভাস সেন ১২। ১৪. গুরইকবাল ১২। ১৫. অভিজিৎ চন্দ্র ১২। ১৬. আভাস সেন১২।

সচিত্র প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৫-র শারদীয়া দেশ পত্রিকায়। ১৪ জন শিশুশিল্পীর ১৬টি ছবি ছাপা হয়েছিল—যা এখানে সংযোজন করা হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদেশের ভিখারী সম্প্রদায়

শৈশবে আমরা প্রথম পাঠ আরম্ভ করিয়া 'গুরুজনে মানিয়া চল', 'চেঁচিয়া কথা কহিও না'র সঙ্গে সঙ্গে 'ভিখারীকে ভিক্ষা দিবে' কথাটাও মুখস্থ করিয়া রাখি এবং পরে বড় হইয়াও আমাদের, ভিখারী মাত্রকেই ভিক্ষা দিবার প্রবৃত্তিটি সংস্কারের মধ্যে পরিগণিত হইয়া দাঁড়ায়।

ইহা ছাড়াও, ত্যাগ বা দয়ার আতিশয্যের আমাদের মধ্যে আরও কারণ আছে: আমরা ঋষির বংশধর, আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিরা সংসারের টাকা পয়সার লেনদেনের ব্যাপার নিয়া কখনো মাথা ঘামাইতেন না,– অর্থমনর্থম বলিয়া ইহার সংশ্রব একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া তপোবনে বৃক্ষতলে বা কুটীরে বসিয়া সোমরস পানে মাতোয়ারা হইয়া সামগানে দিক্‌মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিতেন। ইহার প্রতিটি কথায়, সুরের প্রতিটি স্পন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত কেবল ত্যাগের সুর, দিত জগদ্বাসীকে ত্যাগের প্রেরণা। সেই ত্যাগের সুরই এখন পর্যন্ত আমাদের শিরা উপশিরায় এবং প্রত্যেকটি রক্তকণিকায় অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত।

এইজন্যই পরের দুঃখে বিগলিত হওয়া আমাদের আজন্ম সংস্কার। ভিখারী দেখিয়া দান না করিয়া আমরা পারি না। মানবতা এবং চিত্তের কমনীয়তার দিক দিয়া এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে এই প্রকার দানের প্রবৃত্তিই মানুষকে ক্রমশ ভগবানের কাছে টানিয়া নেয়। বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়া ইহার বিচার চলে না, ভাষা দিয়া ইহার সমালোচনা চলে না, ইহা শুধু মনের জিনিস: আমি ভিখারীকে দান করিয়া তৃপ্তি পাই, আপনি কেন বাধা দিতে চান! কিন্তু জগতের অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইহার বিচার চলে।

পৌরাণিক যুগে অতিথি বৎসলতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতিথি ও ভিখারী এক না হইলেও অনেক রকমে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। অতিথি যেমন আকস্মিকভাবে আসিয়া থাকে, ভিখারীও তদ্রূপ। অতিথি অসময়ে (বিশেষত দুপুরে বা রাত্রে) আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করে এবং রাত্রিবাস করিয়া চলিয়া যায়। ভিখারী ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াই চলিয়া যায়। বিশেষ দায়ে পড়িয়া অতিথি গৃহীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, আর ভিখারীর পেশাই ভিক্ষা, আজ এ-পাড়া, কাল ও-পাড়া এই রকম করিয়া তাহার দিন গুজরায়।

পৌরাণিক যুগে আমরা অতিথির কথাই জানিতে পাই, তথাকথিত ভিখারীর স্বরূপ বিশেষ খুঁজিয়া পাই না। তখনকার অতিথিদের বেশির ভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁহারা ছিলেন দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কাজেই একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে না যে ইঁহারা পরোক্ষভাবে ছিলেন ভিখারীই। ভিক্ষা কথাটা তখনো বিশেষ সম্মানাস্পদ ছিল না বলিয়াই বোধহয় তাঁদের ঐ ভিখারী জীবনটাকে অতিথি বলিয়া লিখিয়া গিয়াছে।

তখনকার যুগে লোকে অতিথি সেবার জন্য সর্বক্ষণের জন্য নিজেরা প্রস্তুত থাকিত, দ্বিপ্রহরে রন্ধনের পর সহজে নিজেরা আহার করিতে চাহিত না, তটস্থ হইয়া বসিয়া থাকিত, রুদ্ধনিশ্বাসে পথ পানে চাহিয়া থাকিত, তাহাদিগকে কৃতার্থ করিতে কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিথি তথা ভিখারী আসে কি না। কিন্তু এত যে অতিথি তথা ভিখারী সৎকারের আয়োজন, ইহা শুধু দান করিবার প্রবৃত্তির জন্যই নয়, নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া কাঙাল সাজা নয়–ইহার পেছনে ছিল একটা ভয়ানক স্বার্থপরতা।

কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিতে হয়। তখনকার ভগবানের কি যে বদখেয়াল ছিল, তখন তিনি সময়ে অসময়ে প্রায়ই লোকদিগকে পরীক্ষা করিতে আসিতেন এবং আসিতেন অতিথি তথা ভিখারীর বেশে, আসিতেন দরিদ্র আর্ত ব্রাহ্মণের বেশে। তখনকার লোকেরা ইহা মনে প্রাণেই জানিত। তা ছাড়া তিনি কখন যে কার ঘরে আসিয়া 'সেবা' চাহিয়া এবং গৃহীর হাড়ভাঙা খাটুনির দ্বারা উপার্জিত অন্নের বেশিরভাগ দ্বারা উদর পূরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহীর স্বগুষ্ঠি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ঘটাইতেন তা তো বলা যায় না। তাই তারা সর্বক্ষণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখিত–'ভিখারীর বেশে এই বুঝি আসে মনচোর, শুনি তার নূপুরের ধ্বনি রিণি ঝিনি–কতদূর ওগো কতদূর!'

এই জন্য বলিতে ছিলাম সে যুগের অতিথি পরায়ণতার উদ্দেশ্যই ছিল নিজেদের স্বার্থোদ্ধার–অতিথিকে দুটি খুঁদ-কুড়া খাওয়াইয়া একেবারে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি! তখনকার অতিথি পরায়ণতা সময় সময় বেশ একটু মারাত্মক গোছের হইয়া দাঁড়াইত, অতিথির যাঞ্চাও বেশ রকমের আরামসূচক ছিল না। যেমন ধরুন কর্ণের কথা, তিনি আপনার ছেলে বৃষকেতুর মাংস দিয়া মাংসাশী দরিদ্র ব্রাহ্মণরূপী অতিথি তথা ভিখারীকে পরিতোষ করাইলেন। তারপর দ্রোণের স্ত্রী ধরা, তিনি নিজের স্তন কাটিয়া দিয়া দোকানীর নিকট হইতে চাউল ডাইল আনিয়া একবার অতিথি তথা ভিখারীরূপী ভগবানের সর্বনাশা উদরটিকে পরিপূর্ণ করাইয়াছিলেন। ঐসব অতিথিরাই ছিলেন তখনকার ভিখারী এবং এই 'অতিথি তথা ভিখারীর বেশে কখন যে কে আসেন বলা যায় না'–এই ভাবটিই এখন পর্যন্ত আমাদের হিন্দুসমাজকে ভিখারীমাত্রকেই খুশিভাবে ভিক্ষাদান ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছে।

AMARBOI.COM

ফকির-বোষ্টম ও মহাপ্রভুর ভেক

আসিল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের যুগ। তিনি 'প্রেমিক গোরা' রূপে আসিয়া প্রেমের বন্যায় হিমালয় হইতে কন্যা কুমারী পর্যন্ত পরিপ্লাবিত করিলেন, করিলেন পাষণ্ড দলন, করিলেন হরিনামে সবাইকে মাতোয়ারা। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার এমন মধুময় ধর্ম অবিকৃত রহিল না। একদিকে যেমন বহু 'পামর ব্যক্তি' প্রেমাস্বাদে মাতোয়ারা হইয়া পাপতাপময় সংসারে নিজেদের মনের মধ্যে 'নিত্য বৃন্দাবন' সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অপরদিকে তেমনি, তাহার প্রেমের সুযোগে সমাজে সৃষ্টি হইল কতকগুলি ভিক্ষোপজীবী পরগাছা, আর কতকগুলি অনাচারী সহজিয়া বা পরকীয়া ভজনকারী মুখোসপরা লম্পট! মহাপ্রভুর 'ভেক' নেওয়া কি চীজ তাহা অনেকেই জানেন। প্রকৃত ধর্মপ্রেরণায় শত শত লোক 'ভেক' গ্রহণ করিতেছেন একথা সত্য কিন্তু ইহার আরও একটা দিক আছে। মহাপ্রভুর 'ভেক' গ্রহণ করিলে কোন শ্রমসাধ্য কাজ করিতে হইবে না, লোকের দশ দুয়ারে মাগিয়া খাইয়া জীবনটা চালাইয়া নিতে পারা যাইবে। এই প্রেরণা হইতেও শত শত লোক এই 'ভেক' গ্রহণ করিতেছে। এইভাবে সমাজে বৈষ্ণব বা বোষ্টম বা বৈরাগী নামে আর এক শ্রেণির ভিক্ষোপজীবীর উদ্ভব হইয়াছে। আউল বাউল নামে ইহাদের আবার শাখাও আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু সমাজের বৈষ্ণব, বোষ্টম ও বৈরাগী শ্রেণির ভিখারী সম্প্রদায়ের কথা আগেই বলিয়াছি, ইহারা ছাড়া আরও এক শ্রেণির সম্প্রদায় হিন্দু সমাজে আছে। গেরুয়া বা হলদে রঙের কাপড় বা কৌপিন পরিয়া, গায়ে একটা সেই রঙের ঢিলা আলখাল্লা লটকাইয়া আর এক হাতে এক একটা ঠাকুরের ছোটখাট মূর্তি লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। কেউ শনির মূর্তি, কেউ লক্ষ্মীর আবার কেউ বা শুবচুনী বা নারায়ণের মূর্তি লইয়া বাহির হয়। সেই সেই দেবতার পুজারী সাজিয়া দেবতার দোহাই দিয়া ইহারা এক একটি পয়সা করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ি হইতে মাগিয়া নেয়।

মুসলমানদের মধ্যে ফকির জাতীয় ভিখারী সম্প্রদায়টাই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। আমাদের সমাজে বৈরাগী বলিতে যাহা বুঝায় ফকিরও অনেকটা তাই। এক একটা 'দরগা'কে কেন্দ্র করিয়া ছোট খাট এক একটা পাড়ায় ফকিরদের বাস।

এই ফকিরদের সংখ্যা এত অধিক যে পল্লীর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই ইহাদের জ্বালায় যার-পর নাই অস্থির হইতে হয়। ইহারা গৃহস্থগণকে কত যে বিরক্ত করিয়া মারে তাহা ভুক্তভোগী পল্লীবাসী মাত্রেই স্বীকার করিবে। সাধারণ পল্লীবাসীদিগকে ইহারা প্রায় জ্বালাইয়া মারে। বয়স্ক বা অসমর্থদের ত কথাই নাই, বলিষ্ঠ জোয়ান যারা, যারা খাটিয়া খাইতে পারে, কর্মানুরাগী ভগবান কর্ম করিবার জন্য যাদের প্রচুর স্বাস্থ্য দিয়াছেন তারাও এইভাবে পল্লীর প্রতিটি গৃহস্থকে বিরক্ত করিয়া ভিক্ষাস্বরূপ চাইল বা পয়সা আদায় করিয়া তবে ছাড়ে।

স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন গৃহী ভিক্ষা দিতে অসমর্থ হইলে বা বিরক্ত বোধে বিমুখ করিলে ফকিরেরা নানা প্রকার শাপমন্যি করিতে আরম্ভ করে। তাই নিজেদের এবং প্রতিবেশীর মঙ্গলার্থেও গৃহী তাহাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিতে বাধ্য হয়। এই সম্প্রদায়টি ছাড়া মুসলমান সমাজে আরও যে একটা ভিখারী সম্প্রদায় আছে, সেটা আরও মারাত্মক। যাহারা পল্লী গ্রামের ছোট বড় হাটগুলি দেখিয়াছেন তাহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন, সেখানকার হাটের গলিতে গলিতে প্রায়ই দুই চারটে অঙ্গহীন লোক পিণ্ডবৎ পড়িয়া থাকে। কেউ হস্তপদহীন, কেউ চোখে দেখে না। কারো দেহগঠন ভগবানের রাজ্যে নিতান্ত অস্বাভাবিক।

ভগবানের শাপে এমন অবস্থায় পতিত দুনিয়ার এই শ্রেণির হতভাগ্যদের জন্য করুণা হওয়া স্বাভাবিক। মানুষ এতটা হীন নয় যে এই দুর্ভাগাদের দেখিয়া নিজের আড়ালেও অন্তত একটা ব্যথার নিশ্বাস ফেলিবে না। কিন্তু ইহাদের লইয়া পুরা একটা সম্প্রদায় বাঁচিয়া রহিয়াছে ভিক্ষা-উপজীবীকাকে অবলম্বন করিয়া। ইহাদের এক একটাকে বাঁশের মাচায় সাজাইয়া গুছাইয়া লইয়া দুই তিনজনে কাঁধের উপর তুলিয়া পল্লীর জমজমাট হাটগুলিতে বিনাইয়া বিনাইয়া দুঃখের কেচ্ছা গাহিয়া ইহারা কেবল পয়সা আদায় করে না, হাটের পসারী ও অন্যান্য লোকেদেরও করে অসুবিধার সৃষ্টি। লোকে করুণায় বিগলিত হইয়া পয়সা, দেয় সেই পয়সায় অভাগাদের কতটুকু উপকার হয় জানি না। তবে ঐ পয়সা দ্বারা এই অভাগ্যদের অন্তরালে থাকিয়া অনেকগুলি নিষ্কর্মা লোক যে সংসারে প্রশ্রয় পাইতেছে একথা সত্য।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী ৫৯
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটামুটিভাবে সম্প্রদায়গত কতকগুলি ভিক্ষোপজীবীর বিষয় উল্লেখ করলাম, এখন দেখিতে হইবে যে এই প্রকার ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া ইহারা অন্য কোন কাজ করিয়া খাইতে পারে কিনা।

বৈষ্ণব, বোষ্টম বা বৈরাগীদের কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। মহাপ্রভুর 'ভেক' গ্রহণ করিলে সংসারের প্রতি কোন আসক্তি রাখা যায় না, পরের দুয়ার হইতে মাগিয়া দুটো 'প্রসাদ' তৈয়ার করিয়া শ্রীগোবিন্দের নামে নিবেদন দিয়া উদরস্থ করিতে হয়–ইহাই এই সমাজের একটি সাধারণ প্রথা। ইহাতে দোষের কিছু নাই, যেহেতু মহাপ্রভু নিজে ভিক্ষা করিতেন। এই ভিক্ষা গ্রহণের স্বরূপ তখন পরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙাই ছিল না, ইহার অন্য স্বরূপ ছিল। সংযম ও নিবৃত্তি মার্গে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্যে তখন মাত্র দু এক মুষ্ঠি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলেই দিন গুজরান করিতে হইত। এই জন্যই বোধহয় তখন, কেহ কেহ বলিয়া থাকে, সন্ন্যাসী বা মহাপ্রভুর ভেকধারীদিগকে দিনে মাত্র তিনটি ঘর হইতে তিন মুষ্ঠি তণ্ডুল গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু আজ এমন নয়। আজ প্রশ্রয় পাইয়া বহু নরনারী যত না যথার্থ ধর্মপ্রেরণায় তার চেয়ে বেশি খাটিয়া খাওয়ার ভয়ে দলে দলে বোষ্টম ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভিখারীর সংখ্যা বাড়াইতেছে। নিরক্ষর হিন্দু সমাজে অনেক স্থলেই দেখা যায় অসহায় বিধবাদের মধ্যে অনেকেই আবার অন্য কোন পথ না পাইয়া মহাপ্রভুর ভেক গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে।

তারপর পুরুষ বোষ্টমদের কথা। আমি এক ভেকধারী বোষ্টমকে জানিতাম। মহাপ্রভুর ভেক গ্রহণের পর স্বতন্ত্র জায়গায় এক আখড়া পাতিয়া সে থাকিত। তাহাদের ধর্মের সনাতন রীতি অনুযায়ী ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারাই তার ঘরে স্থাপিত রাধামাধব জীউর ছোটখাট বিগ্রহের ভোগ্য প্রদান করিত। কিন্তু একদিন ভিক্ষা করিতে যাইয়া কোনও ভিক্ষাদাতার একটি মাত্র শ্লেষপূর্ণ কথায় তার চৈতন্যের উদয় হয়। ইহার পর সে আর ভিক্ষায় যায় নাই। তাহার আখড়ায় রাধা মাধবজীব কুটীরের এখানে সেখানে লাউ কুমড়া সীম গাছ রোপন করিল। লতাইয়া লতাইয়া সেগুলি ঠাকুর ঘর ঘিরিয়া ফেলিল। পরে সত্যি তার তার পরের দুয়ারে ভিক্ষা মাগিবার প্রয়োজন হয় নাই। সে ছাগল পুষিত, তাহার দুধ বাজারে যাইয়া বিক্রয় করিত। কয়েকটা আম গাছ তাহার ছিল, আম বিক্রয় করিত।

এমন কি আম গাছের খোপ হইতে শালিক আর দোয়েল পাখির ছানা পর্যন্ত বিক্রয় করিত। করিয়া সেই পয়সায় কেনা চাউল ডাইল রান্না করিয়া বিগ্রহের ভোগ লাগাইত। এই সকল ধর্মবহির্ভূত কাজ করার দরুণ আশেপাশের বৈষ্ণব সমাজে স্বভাবতই তাহার পাত উঠিল। আমাদের দেশের তথাকথিত ভিখারী বৈষ্ণবগুলিকে যদি আমার চেনা বৈষ্ণবটির পন্থা অনুসরণ করিতে বলি তবে তারা নাক সিঁটকাইয়া বলিবে, সংসার ছেড়েছি কি সংসারে আবার জড়াবার জন্যে। কিন্তু কর্মহীন অলস জীবনযাত্রায় আর আত্মার এবং দেহের অবমাননাকর ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে ভগবানের কোন সত্তাই যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না একথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার দিন আজ আসিয়াছে। নিজের শ্রমদ্বারা অর্জিত অন্নদ্বারা ঠাকুরের ভোগ লাগাইলে ঠাকুর যে তাহা অধিকতর পরিতৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাহা হৌক আমার সে বৈষ্ণবটি আর ভিক্ষাবৃত্তি করে নাই। তাহার সমাজের অন্যান্য বৈষ্ণবদের পীড়াপীড়িতে মাঝে মাঝে তাহাকে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইত সত্য কিন্তু সরাসরিভাবে চাহিয়া কাহারও নিকট হইতে সে কিছু গ্রহণ করিত না। সে বেশ গান গাহিতে পারিত। গোপীযন্ত্র, খঞ্জনী বা রসমাধুরী বাজাইয়া বাড়ি বাড়ি গান গাহিয়া সে লোককে মুগ্ধ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা গ্রহণ করিত তাহাকে সে ভিক্ষা বলিয়া মনে করিত না, মনে কবিত পরিশ্রম দ্বারা লব্ধ।

ফল কথা প্রত্যেক পল্লীতে সহজসাধ্য কুটীর শিল্পাদির প্রর্বতন করিতে পারিলে এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করিতে শিখাইল ইহাদের সংখ্যা কমিতে পারে। আর কমিতে পারে ইহাদিগকে অনাসক্তির মোহ কাটাইয়া নাম-সন্ধ্যা-মালা-জপের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক খাটুনিতে প্রলুব্ধ করিলে; নিষ্প্রাণ ঠাকুর বিগ্রহদেবের সেবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মময় বাস্তব অনুভূতির সৃষ্টি করিলে।

এবার ফকির ভিখারী সম্প্রদায়ের কথা। এদেশের মুসলমানগণই সাধারণত কৃষিজীবী। ফকিরদেব সংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া ছোটখাট কৃষিকাজগুলিতে লাগাইলে এদের দ্বারা বেশ কাজ হইতে পারে। এ স্থলে বিচার্য যে দরগার চারিপাশে আড্ডা গাড়িয়া ধর্ম সাধনার চাইতে খাটুনি হইতে শরীরকে বাঁচাইয়া 'সুখের ভাত' খাওয়াই অনেক স্থলে ইহাদের লক্ষ্য। ভিক্ষার আকাল পড়িলে অনেক সময় ইহারা গুণ্ডামির আশ্রয় নেয়। ইহাদের অনেকেই আবার রাত্রিতে জাঁকালো ফকিরি স্টাইলের পোষাক পরিয়া পঞ্চ প্রদীপ সাজাইয়া বড় বড় হাঁকডাক দিয়া ধর্মভীরু পল্লীবাসীদিগকে চমকাইয়া দিয়া পয়সা আদায় করিতেও দেখা যায়। এই সকল ব্যাপার নিশ্চয়ই খাঁটি ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ নয়।

পল্লীবাসীরা ধর্মভীরু, তারা সরল প্রাণ, তারা খাটিয়া খাইতে জানে। কর্মবিমুখতা এখনো তাদের মধ্যে দেখা দেয় নাই। এই কথাটি তাদের অনেকেরই জপমালা—

সোনা রূপার দুখানা হাত
যেখানে লড়িবে সেখানে ভাত।

ভগবান হাত দিয়াছেন কাজ করিবার জন্য, ভগবানের আশিষ রূপ এই দুইখান হাত দিয়াই মানুষ কত বড় বড় কাজ করিতেছে। ইহাকে কাজে না লাগাইয়া নিতান্ত অপমানিতভাবে পরের দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া এই সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার কারও অধিকার নাই!

এই কয় বৎসরের অর্থকষ্টের ফলে দেশে অনেকগুলি নূতন ভিখারীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের ভিক্ষার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে পাষাণও বুঝি গলিয়া যায়। কারো উপুসী ছেলের মুখে দিবার একটু ভাতের মাড় মিলে না, কারো পরিবারে সব কয়টি প্রাণী পাঁচদিন ছ'দিন ধরিয়া উপবাসী এইসব। এরা নাকি আর কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না বলিয়াই গলায় গামছা জড়াইয়া ভিক্ষায় বাহির হয়। কিন্তু সত্যই কি ভিখারীদের কোন উপায় নাই, বা করিবার তারা কিছু পায় না? এমন অনেক কাজ নিশ্চয়ই আছে যা লোকে করিতে সাধারণত কুণ্ঠাবোধ করিবে। কিন্তু এক চুরি করা ছাড়া যে কোন কাজ মাত্রই ভিক্ষা করার চাইতে ভাল। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি অসম্মানজনক মনে হইতে পারে, কিন্তু ভিক্ষার অপমান এতে নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পল্লীতে বার মাসে তের পার্বণ হয়। এক এক সময়ে একটা না একটা লাগিয়া থাকে, তাতে ভিখারীরও আমদানি হইয়া থাকে। তারা ভিক্ষা হিসাবে এক পেট খাবার না খাইয়া, উৎসব বাড়ির অনেকগুলি খুঁটিনাটি কাজের কিছু কিছু করিয়া দিয়াও খাইতে পারে। এ খাওয়াকে ভিক্ষা বলিলে সত্যি ভুল বলা হবে।

পল্লীর গ্রামে গ্রামে শত শত হাট-বাজার আছে, কোনটা সপ্তাহে দুইবার তিনবার করিয়া কোনটা বা প্রতিদিন করিয়া বসিয়া থাকে। যে কেউ দেখিয়াছেন তিনিই জানেন হাট-বাজার বসিবার জায়গাগুলি কত অপরিষ্কার অপরচ্ছিন্ন। এতে কত রোগের বীজাণু উৎপন্ন হইয়া থাকে, কত দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে এবং হাটের পসারীদের অসুবিধা ও স্বাস্থ্য হানির কারণ ঘটাইয়া থাকে। ভিখারীরা হাট বসিবার আগে অনায়াসেই ঝাঁটা হাতে করিয়া সে সব জায়গা পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করিয়া রাখিতে পারে। এতে পসারীদের কত আনন্দের কারণ হয়। তখন তাদের কাছে শ্রমের মূল্য স্বরূপ কলাটা মূলোটা চাহিলে সেটা ভিক্ষা করা হইবে না। তারাও সানন্দে উহা দিতে ইতস্তত করিবে না।

পল্লীতে রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও আবর্জনা দূর করিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। ভিক্ষা ভিন্ন যাদের গত্যন্তর নাই তারা সেই সব পরিষ্কার করিয়া অল্পায়াসে পাড়ার লোকেদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে। ভিক্ষা না করিয়া মরশুমের সময় গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ধান ভানিয়া বা নালিতার মরশুমে নালিতা ছাড়াইয়া দু' মুঠোর জোগাড় করিতে পারে। চেষ্টা করিলে ছোটখাট কুটীরশিল্প সংক্রান্ত কাজগুলি তারা অনায়াসে করিতে পারে। সস্তা দরে বাঁশ কিনিয়া চুপড়ি ঝাঁপি প্রভৃতি জিনিস অনায়াসে তৈরি করা যায়। এসব কাজ আজকাল লাভজনক না হইলেও ভিক্ষার চাইতে শতগুণে ভাল। নিতান্ত ভিখারী হইলেও মাথা গুঁজিবার মত একখণ্ড ভূমি নিশ্চয়ই তাদের থাকে। মাটিতে পরিশ্রমীর জন্য ভগবান সোনা লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কষ্ট করিয়া মাটি কোপাইয়া লাউ-কুমড়া সিমের গাছ ইচ্ছা মাত্রই করিতে পারে। অথচ এগুলি বাজারে কত চড়া দামে বিক্রয় হয়। আরো কত কাজ আছে যা নাকি ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে অনায়াসে করিয়া ভাতের জোগাড় করা যায়। তবেই চাই সেই অনুপাতে মনোবৃত্তি। 'মাগিয়া খাইব না' বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প থাকিলে এবং শরীরে এতটুকু শক্তি থাকিলে মানুষ উপোসে মরিবে না, একথা সত্য।

যাদের জন্য এত কথা বলিলাম তারা হয়ত এসব বুঝিবে না। কখনো এ লেখা তাদের হাতে পড়িবে না। এ লেখার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে আমাদেরই। তাহাদিগকে কাজের কথা দেখাইয়া হীন ভিক্ষামনোবৃত্তি তাদের দূর করিতেই হইবে। তাদের বুঝাইয়া বলিতে হইবে, তুমি ধর্মার্থী সাধু সন্ন্যাসী আর ফকির বাবাজী যাই হও না কেন, কাজ করিয়া খাও, পরের শ্রমের অন্নে ভাগ বসাইবার তোমার কোন অধিকার নাই। নির্ঝঞ্ঝাটে ভগবৎ আরাধনা করিতে চাও, বেশ ত কর না, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া করিও না। নিজের শ্রমের দ্বারা পেট চালাও, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম উপাসনা যাহা করিতে হয় কর।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : মে ১৫, ১৯৩৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম্রতত্ত্ব

আমাদের দেশে আমের সম্বন্ধে নতুন কিছু বলিতে যাওয়াও যাহা, চক্ষুষ্মান সুজনকে আলো দেখাইতে যাওয়াও তাহা, কারণ এদেশের নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই অত্যুৎকৃষ্ট ফলটির সঙ্গে সুপরিচিত। আমাদের দেশ গরীবের দেশ। আঙুর, বেদানা, কিসমিস পয়সা দিয়া কিনিয়া প্রচুর পরিমাণে উদরসাৎ করা খুব কমলোকের ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু বাঙলার পল্লী অঞ্চলে এমন গৃহস্থ খুব কমই আছে যাহার বাতায়ন সন্নিকটে, রান্নাঘরের পিছনে কিংবা বাড়ির আশে পাশে দুই একটা আমগাছ নাই, বড় বড় বাগওয়ালাদের কথা নাই বা বলিলাম। প্রকৃতির আশীর্বাদমণ্ডিত দক্ষিণ হস্তের স্পর্শের প্রভাবেই হৌক, আর বাঙলার মাটি বাঙলার জলের পুণ্য প্রভাবেই হৌক–স্বাদে গন্ধে উপকারিতায় পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন সুখ্যাত ফলের সঙ্গে গুণ-গরিমায় সমতুলনীয় এই আম্র ফলটির সদ্ব্যবহার রাজা জমিদারদের প্রাসাদ হইতে চাষাভূষাদের আঙিনা পর্যন্ত সবখানেই চলিয়া আসিতেছে।

এমন একটি গুণময় সর্বজনীন ফল হইতে ভারতবাসী বঞ্চিত হইলে রসনা পরিতৃপ্তিকর আর কোন চিজ দিয়া যে ইহার ক্ষতিপূরণ চলিত তাহা ভাবিতে বিস্ময় লাগে। আমকে বলা হয় ফলের রাজা। এই রাজাকে মনোহর বেশে নানা দেশে দেখা গেলেও ভারতবর্ষেই তার পূর্ণ আধিপত্য এটুকু বলিলে বোধ হয় বেশি বলা হয় না। স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ-মাধুর্য, আকারের বৃহত্তত্ত্ব, ফলনের প্রাচুর্য প্রভৃতির দিক দিয়া ভারতবর্ষের আমই সর্বশ্রেষ্ঠ একথা ভুল নয়। এই আম এখন যেমন ভারতের সর্বজাতির রসনা জোগাইতেছে, ভবিষ্যতে যেমন জোগাইবে তেমনি সুদূর অতীত হইতেই জোগাইয়া আসিতেছে। এবং সে সুদূর অতীত যে কতখানি সুদূর, কতকাল হইতে যে এইভাবে জোগাইতেছে বলা শক্ত। এমন একটি আস্বাদপূর্ণ সরস ও সরেস ফলের জন্ম কিভাবে হইল, কোন দেশ হইতে কিভাবে সর্বপ্রথমে এদেশে আসিল, বিশ্বামিত্রের মত কোন মহাঋষি নব ভূভাগ সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া গাছে মানুষ (নারিকেল) ফলাইবার মত কোন মহত্তর সংকল্প লইয়া এতবড় রসাল সৃষ্টি করিয়া বসিলেন কিনা, এ সকল প্রশ্ন লোকের মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। সেকালের খোকা খুকিদের মনে খেলাধুলার অবসর ক্ষণে এসকল প্রশ্ন জাগিত। আর সেকালের ঠাকুরমারা তাদের সেই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতেন। তারা বলিতেন, আম সত্যযুগে কোথায় ছিল জানা যায় না, ত্রেতাযুগে ছিল লঙ্কাতে। হনুমান বাবাজী নির্বাসিতা সীতার নিকট হইতে উপহার প্রাপ্ত হইয়া উহা রসনাসংযোগে ও উদরপ্ত করিবার কালে এতদূর মুগ্ধ হইয়া যান যে তৎক্ষণাৎ তাহার পোড়া স্বদেশের কথা মনে পড়িল। সে দেশ এই ফলটি হইতে বঞ্চিত। তিনি আম খাইয়া ইহার আঁটি সাত সমুদ্র তের নদী ডিঙাইয়া তাহার মাতৃভূমি ভারতবর্ষে ফেলিতে লাগিলেন। তখন হইতেই এদেশে আমের জন্ম। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বিচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধিশীল পাঠক হাসিবেন না। যিনি একলাফে সমুদ্র ডিঙাইতে পারেন, যিনি সূর্যকে বগলদাবা করিয়া গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন করিতে পারেন, তাহার শ্রীহস্তের 'ঢিল' যে লঙ্কাদ্বীপ হইতে ছুঁড়িত হইয়া ভারতে আসিতে পারে না তার স্বপক্ষে কোথাও যুক্তি নাই। হনুমানের স্বদেশপ্রিয়তাটুকুই অনুকরণীয়।

হারুণ অল রসিদের আমলের একটি গল্পেও ভারতের আম জয়যুক্ত হইয়া আছে। তিনি ভারতের আমের সুখ্যাতি শুনিয়া উহার জন্য জনৈক শ্মশ্রুধারী কাজীকে পাঠাইয়াছিলেন। কাজী বাবাজীর ফিরতি পথে আম নষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি স্বীয় শ্মশ্রুতে তেঁতুল আর গুড় মাখিয়া প্রথমে রাজা হারুণ অল রসিদ, তারপরে তস্য রানী, তারপরে ক্রমশ পদমর্যাদা অনুসারে অন্যান্যকে তাঁহার শ্মশ্রু চুষিতে দিয়া আমের স্বাদ হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন।

বাঙলাদেশের ছড়া বা হেঁয়ালিতেও আমের স্থান আছে। পল্লী লোকদের প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য কিংবা বাড়িতে নয়া জামাই আসিলে তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্মতা পরীক্ষার জন্য এইরূপ হেঁয়ালি কাটিতে দেখা যায় :

মকরেতে জন্ম তার কুম্ভে তারে চায়।
মীন সংযোগে তারে কিছু কিছু খায় ॥
ভালোমতে খায় তারে মেষে আর বৃষে।
মূর্খে বুঝিবে থাক পণ্ডিতে বুঝে শেষে ॥

মকর অর্থাৎ মাঘ মাসে তার জন্ম, কুম্ভ অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে গাছের পাতার ফাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে আত্মপ্রকাশ করিলে গ্রাম্য ছেলেদিগকে উহার প্রতি লুব্ধ লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে দেখা যায়। মেষে আর বৃষে অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে উহা যখন পাকিতে আরম্ভ করে তখন সবাই পরিতৃপ্তির সহিত খাইতে পারে।

এই সবই ত গেল একদিককার কথা। এখন কাজের কথায় আসা যাক। হাস্য পরিহাসের অন্তরালে করুণ ব্যাপার এই যে প্রকৃতিগত এত বড় একটা ভাল জিনিস থাকা সত্ত্বেও ইহার ফলনকে উন্নততর প্রণালীতে বর্ধিত করিবার বা এই গরীব দেশে ইহার ব্যবহারকে 'অর্থকরী' ব্যাপারের দিক দিয়া কাজে লাগাইবার বিশেষ কোনো চেষ্টাই নাই। পল্লীর গৃহস্থেরা দুই চারটি করিয়া প্রায় প্রতি বাড়িতে আম্রবৃক্ষ রোপণ করে সত্য কিন্তু উহা দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন মিটানো ছাড়া আর কোন কাজেই লাগানো হয় না। যথারীতি পরিশ্রম করিয়া 'বাগ' নির্মাণ, কলপ দেওয়া, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্বাদের আকারের ও বর্ণের আম ফলাইয়া পয়সা উপার্জন এরূপ চেষ্টা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে সত্য, কিন্তু তা অতি সামান্য। পল্লী বাঙ্গালায় খাদ্যাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি অনেক রকমের অভাবই আছে। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ বাড়িতেই মাথা গুঁজিবার ঠাঁইটুকু ছাড়া প্রয়োজনের বাহিরের কম বেশি কিছু না কিছু জায়গা আছে। আবার অনেক জায়গা পতিত অবস্থায় দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিতেও দেখা যায়। এই সকল জায়গা অবসর সময়ে পরিশ্রম করিয়া কৃষি ফলাইলে নিজেদের প্রয়োজন মিটানো ছাড়াও দুই পয়সা আয় হইতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও বিশেষজ্ঞের মুখে শুনিয়াছি যত্ন করিয়া আম ধরাইতে পারিলে এক একটা গাছে অনেক টাকার আম পর্যন্ত ফলানো যায়। বাজারে আমের চাহিদা অসাধারণ। উহার জনপ্রিয়তাও কম্মিনকালে কমিবার নয়। উহার ফলন দ্বিগুণ বর্ধিত হইলেও বাজার নেহাৎ মন্দা হইবার আশঙ্কা নাই। কাজেই প্রায় প্রত্যেক গৃহস্ত বাড়িতেই ইহার কয়েকটা গাছকে সযত্নে ফল ধরাইয়া বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখিলে লাভবান হওয়া যায়।

শুধু রসনা পরিতৃপ্তির জন্যই আম্রের সৃষ্টি নহে। উহার কাঠ খুব সারবান ও দামী। উহা দ্বারা প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, ইহা সকলেরই জানা আছে। আমের আঁটি কবিরাজী ও নানা টোটকা চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

ইহা ছাড়া আম্রকে কুটীরশিল্পরূপে ব্যবহার করার ইঙ্গিত আমাদের চোখের সম্মুখে রহিয়াছে। বৈশাখের জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে যখন গাদা গাদা কাঁচা আম গাছ তলায় ঝরিয়া পড়ে, ছেলেদের মধ্যে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে 'আম কুড়াইবার ধুম' লাগিয়া যায়, তখন ঐ কাঁচা আম শুধু ছেলেদের রসনার খোরাক যোগাইতে না দিয়া ঐ আম টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া আমশী প্রস্তুত করিলে গরীব ঘরের উদরান্নের জন্য উদ্যস্ত পুরলক্ষ্মীগণের দু'পয়সা আয়ের পথ হয়। পল্লীগ্রামের অনেক হাট বাজারেই আমশী বিক্রয় হইতে দেখা যায়। উহা ব্যঞ্জনে ব্যবহার করা চলে। আমের জেলিও রসনায় জল আনয়নের বিশেষ অনুকূল পদার্থ।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : মার্চ ১২, ১৯৩৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ষার কাব্য

ভারতীয় কথাসাহিত্যে বর্ষা উপভোগের তিনটি যুগধারা আমরা দেখিতে পাই। তিনটি ধারাই বিরহানন্দের অশ্রু-মদির প্রবাহ বেগে চলিয়াছে। বেদনা মাধুর্যের এমন অকপট প্রকাশ কাব্যের অন্য কোন ধারাতেই নাই। মেঘ দর্শনে বিরহী যক্ষের হৃদয়াবেগ ছন্দে গাঁথিয়া কালিদাস অমর হইয়া আছেন। পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব কবিগণ প্রিয়সুখবঞ্চিতা ব্রজাঙ্গনাগণের ব্যাকুলতা ও প্রতীক্ষমানতা লইয়া অপূর্ব বর্ষাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার পরে রবীন্দ্রনাথের যুগ। তিন যুগের বর্ষা কাব্যের মূল সুর বেদনার সুর, না পাওয়ার সুর, আর না পাইয়াও গভীরভাবে অনুভব করিবার সুর। কিন্তু উহাদের প্রকৃতি ত্রিধারায় বিভক্ত।

বর্ণনার পুষ্টতা ও বলিষ্ঠতা এবং রাজসিক ঐশ্বর্যের সালঙ্কার আড়ম্বরে কালিদাসের বর্ষাকাব্য অমর হইয়া আছে। কালিদাসের মেঘ কোথাও শৈলগাত্রে সোহাগমত্ত মাতঙ্গকে মাতাইয়া, কোথাও বা বিদিশা ইত্যাদি নগরীর পুষ্প স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা রূপসী প্রেমার্ঘ্য রচয়িত্রীদিগকে সুখ স্বপ্নের স্পর্শ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভারতের দুই প্রান্তে প্রিয়প্রিয়াবিচ্ছেদাকুল দুইটি নরনারী শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও উহাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক রূপে যে মেঘ উত্তর ও পূর্ব মুখে যাত্রা করিয়াছিল তাহার গতিপথের সর্বত্র যে বিদগ্ধপুলকের প্রাচুর্য ছড়াইয়া গিয়াছে। এই ঐশ্বর্যবিস্তৃতির সজীবতার পর ব্রজ-বিরহের ভাববিস্তৃতি বর্ষাকাব্যকে রসমধুর করিয়াছে। কালিদাসের অলঙ্কার সম্বেগের পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিগণের ভাবমাধুর্য মণ্ডিত হৃদয়াবেগ আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে।

এখানে স্থানব্যাপ্তির বাহুল্য নাই, নগরী-নাগরী ও করীযুথের সঙ্গে করমর্দনের প্রয়াস নাই। ব্রজাঙ্গনা–শিখা নৃত্য, তমাল শাখার মধ্যপথে মেঘ সমাগম, যমুনা-নীরে মেঘচ্ছায়া, স্থানে স্থানে কদম্বরেণুর আবেগময় আবেশ এই নিয়াই প্রাণের অর্ঘ্য বিরচনে নিরত। এখানে মেঘের রূপের মধ্যদিয়া দয়িতের রূপ উপলব্ধির আড়ম্বরহীন বাসনা বিলাস। একাকিত্বের ভয়-বিজড়িত প্রিয়সঙ্গবাঞ্ছার ফুকার এবং মেঘময় মেঘবরণের বুকে আত্মসমর্পণের গভীর ঐকান্তিকতা এখানে বর্ষাকাব্যের রূপ দান করিয়াছে।

চির সঙ্গসুখানুলিপ্তের সাময়িক বিচ্ছেদের আকুলতাকে কালিদাস কল্পনার দৌলতে বেগবান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব বর্ষাকাব্যের মূলতত্ত্ব ছিল পাওয়ার উৎকণ্ঠা বা গভীর আসঙ্গলিপ্সা। রবীন্দ্র বর্ষাকাব্যের পরমাত্মা পাওয়া বা পাওয়ার হর্ষ দোলায় আন্দোলিত। বর্ষার নিবিড়তার মাঝে, বাঞ্ছিত অনুষঙ্গকে হৃদয় দিয়া উপভোগ করার সুখানুলেপ এখানে প্রত্যক্ষ নহে। বর্ষার সমগ্র রূপকে জীবনের সঙ্গে অভিন্ন করিয়া উপলব্ধির আনন্দ এখানে স্বতঃউৎকর্ণ হওয়ার প্রশ্ন এখানে না উঠিয়া বরং প্রকৃতির সঙ্গে, কেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীপাদির আন্দোলিত শাখাপত্রের প্রচুরতার সঙ্গে বর্ষণের রিম-ঝিম রুণু-রুণু ধ্বনিকে মনের গভীরে ধ্যান করিবার আনন্দই এখানে অখণ্ডরূপে বিরাজিত।

বর্ষাকাব্যের চতুর্থ স্তর এখনো বিরচিত হয় নাই। বঙ্গ পল্লীতে কেয়া কদম্ব সবই ফুটিয়া বর্ষার রূপমাধুরী বিকাশ পায়। কিন্তু পল্লীর লোকেরা উহা উপভোগ করিতে পারে না। আকাশে বর্ষা মেঘময় বেণী এলাইয়া দিলে উহারা আপনাদের অবিন্যস্ত ঘর ঝরানো কুটিরের চালের ফুটা দেখিয়া শঙ্কিত হয়–শিশু সন্তান ও তাহাদের ছোট ছোট জামাকাপড়গুলিকে হয়ত বাঁচানো যাইবে না। বর্ষণ আরম্ভ হইলে আতঙ্কে অস্থির হয়–যে বর্ষা তাহাদিগকে ফসল জন্মানোর সুযোগ দিয়াছে সেই বর্ষা হয়ত পক্ক শস্য ঘরে তুলিবার সুযোগ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবে। শুধু তাই নয়, প্রথম বর্ষণের পর যে প্লাবণ আসে, তাহাতেও নিমজ্জমান ধান ও পাট গাছগুলির দিকে তাহারা শায়কবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সকাতরে তাকায়, দেখে এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করিয়া গাছগুলি ক্রমশ কেমন ভাবে জলের নিচে তলাইয়া যাইতেছে। বর্ষা মঙ্গলের চতুর্থ ধারা কোন ভাষায় কোন সুরে লেখা হইবে কে জানে সে কথা।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : মার্চ ৩০, ১৯৩৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোকেয়া জীবনী

পুস্তক-সমালোচনা

যে আদর্শ মহিলার কর্মবহুল জীবনালেখ্য আলোচ্য পুস্তকে চিত্রিত হইয়াছে, তিনি অসাধারণ সংগঠনশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্তব্যপথের সমুদয় বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার অদম্য উদ্দীপনা তাঁহাতে ছিল। সর্বোপরি জ্ঞানার্জনের অফুরন্ত স্পৃহা তাহাকে সকল প্রকার প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যদিয়াও সাফল্যের উচ্চশিখরে উন্নীত করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আশানুরূপ সুপ্রচার হয় নাই। ইহার জন্য তাঁহার নীরব সাধনা যতখানি দায়ী, মুসলমান সমাজের তাঁহার প্রতি অমনোযোগিতা তাহা অপেক্ষা কম দায়ী নহে।

প্রায় পৌনে এক শতাব্দী পূর্বে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেকালের রক্ষণশীল মুসলমান বড় ঘরের যেসব চিত্র আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় তখন বোরকার অন্তরালে অবরোধবাসিনী হতভাগিনীগণকে কি রকম ক্লেশময় কারাজীবন অতিবাহিত করিতে হইত। সেখালের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শিক্ষার কথা ছিল কল্পনারও অতীত। সেই ভীষণ অতি রক্ষণশীলতার জ্বালাময়ী আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও কতদূর আগ্নেয়-জ্ঞানপিপাসা থাকিলে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া জীবনকে জ্ঞানামৃতে অভিসিঞ্চিত করা যায় তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই রোকেয়া জীবনী।

মুসলমান নারী সমাজের প্রতি তৎকালীন মর্মবিদারী অভিশাপ তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহার স্বীয় জীবনের জ্বালাময় অভিজ্ঞতা হইতে; এবং পরবর্তী জীবনে তিনি অপরাজেয় কল্যাণবুদ্ধি লইয়া এক হস্তে সমাজের অশিক্ষা কুশিক্ষা এবং কুসংস্কার নারীত্বের প্রতি অবমাননার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং অন্য হস্তে শিক্ষা-বর্তিকা ধারণপূর্বক জাগরণের অভয়বাণীতে নারী সমাজে মঙ্গলময় উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বীয় জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া এবং স্বামীর ও স্বীয় উপার্জনের শেষ কপর্দকটি দিয়া তিল তিল করিয়া যে সুবিখ্যাত সাখাওয়াত মেমোরিয়েল গার্ল স্কুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সে সাধনা আজ পরিপূর্ণভাবে সফল হইয়াছে।

বস্তুত বঙ্গীয় মুসলিম নারী সমাজ তাঁহাদের জাগরণের জন্য এবং শিক্ষাদীক্ষার পথ সুগম হওয়ার জন্য এই মহীয়সী মহিলার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞাকিবেন। নারীজাতির জন্য তাঁহার অন্তরের দরদই তাঁহাকে নারীদের কল্যাণের জন সর্বস্ব সমর্পণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। শুধু মুসলমান নারীগণের নহে, হিন্দু মুসলমান সমভাবে সকল নারীগণেরই তাই এই বিশালপ্রাণ মহিলা প্রাতঃস্মরণীয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা এই বিরাটপ্রাণা মহিলা কর্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার, তাঁহাকে বুঝিবার এবং একসঙ্গে নারীহিতমূলক কাজ করিবার সুযোগ পাইয়ছিলেন, কাজেই তিনি যে তাঁহার জীবনী-গ্রন্থ প্রণয়নের অধিকারিণী তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনি নিজেও বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখিকাগণের অগ্রগণ্যা। 'বুলবুল' নামক উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য বিষয়ক একখানা মাসিকপত্র সম্পাদনা করিয়া এবং কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে যশ অর্জন করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার লেখা সম্বন্ধে পরিচয় দিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থখানার সর্বত্রই তাঁহার পাকা হাতের পরিচয় রহিয়াছে। লেখিকার ভাষা চমৎকার, বর্ণনাভঙ্গী উপভোগ্য, প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। সমগ্র গ্রন্থখানা আগোগোড়া একখানা মনোরম উপন্যাসের মতই এক নিঃশ্বাসে শেষ করিবার মত। ভাষার সংযম এবং শুচিতাও গ্রন্থখানার অন্যতম সম্পদ। বাঙলার প্রত্যেক শিক্ষানুরাগিণী মহিলা ও শিক্ষার্থীগণের হাতে এই গ্রন্থখানা শোভা পাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বিশেষ করিয়া, স্কুলের মেয়েদের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এখানা সর্বাংশে যোগ্য। আমরা টেক্সট বুক কমিটির কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বইখানার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি।

সামসুন নাহার বি. এ প্রণীত। ২৩ ক্রেমেটোরিয়াম স্ট্রীট, কলকাতা 'বুলবুল পাবলিশিং হাউস' হইতে মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বি. এ কর্তৃক প্রকাশিত। উৎকৃষ্ট কাগজে আগাগোড়া পাইকা হরফে পরিষ্কার ছাপা, কাপড়ের বাঁধাই, দাম এক টাকা।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : জানুয়ারি ২১, ১৯৩৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টি এস এলিয়ট

মিঃ টি এস এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot) এ বৎসর (১৯৪৮) নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। গত ৪ঠা নবেম্বর সুইডিস একাডেমির সাহিত্য শাখার এক অধিবেশনে এই পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়। এই সংবাদে পৃথিবীর নানা দেশের কাব্যরসিকগণ নিশ্চয় আনন্দিত হবেন। কারণ, বড় কবি মাত্রই দেশকাল ভেদে সকল কবিরই স্বগোত্র হলেও, কবি এলিয়টের প্রভাব সমসাময়িক কবিতায় ও কবিদের মধ্যে যত গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে, তেমনটি খুব কমই দেখা যায়। সেদিনের রোমান্টিক পৃথিবী থেকে আজকের পৃথিবী অন্য রকম। তার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর কাব্যাদর্শেরও যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন হবার ছিল, এলিয়টের ন্যায় শক্তিধর কবি সে কাজ সিদ্ধ করে যুগের চাহিদা পূরণ করেছেন বলা চলে।

রোমান্টিক কবিতা ও এলিয়টের কবিতার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য, তা অল্প কথায় বোঝানো সম্ভবপর নয়। কথা ছন্দ ভাবের ললিত বিলাস ও তার বাহুল্য রোমান্টিক কবি ও পাঠক উভয় গোষ্ঠীকেই মশগুল করে রাখে। মানুষকে সেখানে মাটিতে পাওয়া ভার, তারা হাওয়াতে উড়ে বেড়ায়। সেখানে মানুষ সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলাই রসের উৎকর্ষের পরিচায়ক। এই অতিবিরাট, সুতীব্র অনুভূতিপ্রবণ প্রভাবশালী কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামশীল আজকের এই টি এস এলিয়ট।

রোমান্টিক কবিতার মূলে আছে ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধ প্রেরণা মাত্র; কিন্তু এলিয়টের কবিতার মূলে আছে সমষ্টির দুঃখবেদনা অভাব নৈরাশ্যকে বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে দেখার এবং এমন কি নির্মম হয়েও, তার অন্তরের হাহাকারকে ভাষা দেবার ক্ষমতা। তাঁর এই অসাধারণ ক্ষমতার বলেই রোমান্টিকের সঙ্গে তাঁর এই বিরোধ তাঁর নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নানা দেশের কাব্যজগতে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সর্বত্রই কবিচিত্তে একটা সংগ্রামশীলতা জাগিয়ে তুলেছে। এই একটি মাত্র লোককে কেন্দ্র করে কাব্যের, একটা বিরাট জগৎ গড়ে উঠেছে–আকাশে তার পক্ষবিস্তার নয়, মাটিতে তার পদ দৃঢ়সংবদ্ধ। তাঁর প্রতিভা যেমনি মৌলিক তেমনি প্রচণ্ড না হলে, এটা সম্ভবপর হত না।

সম্ভবত এই দিকটি লক্ষ্য করেই 'ক্ষুরস্য ধারা'র (Razor's Edge–ঔপনিষদিক পট–ভূমিকায় রচিত যুগান্তকারী উপন্যাস) লেখক সমরসেট মম এলিয়টকে বলেছেন বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর মৌলিক কবি।

কোথায় এই মৌলিকতার উৎস, সে বিচার করতে হলে আমাদের অধিক দূর যেতে হবে না।

ইংরাজী ১৯৩০-এর কাছাকাছি সময়টা ইংরাজী সাহিত্যে ভাবধারার দিক দিয়ে এক দূরপ্রসারী পরিবর্তনের যুগ। এই সময়ের নূতন এক সাহিত্যিক গোষ্ঠী দৃঢ় পদচারণায় এগিয়ে আসেন সাহিত্যের পাদ-প্রদীপে; একদিকে তরুণ বুদ্ধিজীবী মানসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং অন্য দিকে সংস্কৃতিসম্পন্ন পাঠক সাধারণের মধ্যে তাঁরা গভীর ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলেন।

১৯৩০-এর কাছাকাছি সময়েই তাঁদের যুগান্তকারী লেখাগুলো প্রকাশিত হয়। ত্রিশ সালের এই তরুণ বিদ্রোহীদের দলে অগ্রগণ্য রূপে পাই কথাশিল্পীদের মধ্যে জেমস জয়েস, অলডাস হাক্সলি ও ভার্জিনিয়া উলফকে এবং কাব্যস্রষ্টাদের মুখপাত্ররূপে পাই টি এস এলিয়টকে। যুদ্ধপূর্ব যুগের জনপ্রিয় কথাশিল্পী গলসওয়ার্দি, ওয়েলস, বেনেট প্রভৃতির বিরুদ্ধে জেমস জয়েস ও ভার্জিনিয়া উলফ তো পুস্তিকা লিখে সংগ্রামই ঘোষণা করে দিলেন। এদিকে অলডাস হাক্সলিও ঔপন্যাসিক ধারণায় ঘটালেন বিপ্লব।

এদিকে এঁরা অগ্রযুগের গদ্য-রচয়িতাদের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম চালালেন, এলিয়টও তেমনি পদ্য-রচয়িতাদের বিরুদ্ধে তূণ থেকে বার করলেন ব্রহ্মাস্ত্র; নূতন চিন্তা, নূতন টেকনিক, নূতন মননের নিদর্শন নিয়ে বেরুল তাঁর কবিতা। এই 'নূতন' আসলে কি? তাঁদের রচনাগুলো বিশ্লেষণ করলে এই নূতনকে আমাদের চিনতে বিলম্ব হবে না। বহুপুরাতনের মণিকোঠা থেকে উৎসারিত হয়ে এসেছে এই নূতন। এই নূতনই হাক্সলি ঈশার-উডকে যোগী বানিয়েছে! এলিয়টের কাব্যের যে রোমাঞ্চকর মৌলিকতা, এরও উৎস কি এইখানেই? সমুদ্র মৌলিক, কিন্তু তাকে মন্থন করে, যে সুধা ওঠে, তাকেও কি মৌলিক বলব না? উপনিষদের ক্ষীর-সমুদ্র থেকে মন্থন করেই তোলা হয়েছে এই মৌলিক কাব্যসুধা আজকের দিনে একথা অসম্ভব মনে নাও হতে পারে! অন্তত এ যুগের যে সকল পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে বিবর্তিত করেছেন তাঁদের অনেকেই যে মনে প্রাণে বৈদান্তিক একথা সুবিদিত। এলিয়টের কাব্য পাঠে মনে হবে বেদান্তের হাওয়া এর গায়েও কিছু লেগেছে। রোমান্টিসিজমের সঙ্গে সংগ্রাম এক হিসাবে ভোগ-লালসা ও ক্লেদাক্ত রাজসিকতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারায় সর্বত্র ত্যাগকে ছোট করে ভোগকে বড় করা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের আদর্শ তার ঠিক উলটো। এখানে মানুষকে মানুষরূপেই দেখা হয়েছে এবং পার্থিব অসারতা ও নশ্বর ভঙুরতাকে ইন্দ্রিয় সুখলালসার থালা সাজিয়ে চাপা দেবার চেষ্টা হয়নি। এলিয়টের কাব্যজগৎ যদি এইখানে ভূমিস্পর্শ পেয়ে থাকে তো সেটা অসম্ভব কিছু নয়।

২.

এলিয়ট নোবেল প্রাইজ পেলেন ষাট বৎসর বয়সে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান মাতাপিতার সন্তান এলিয়ট মিসৌরীর অন্তর্গত সেন্ট লুইনাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি ইংলন্ডে বসবাস করছেন।

এলিয়ট পিতার সপ্তম ও কনিষ্ঠ সন্তান। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত করে হারভার্ড গ্রাজুয়েট স্কুলে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের Sorbonne-এ ফরাসী সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। পরের তিন বৎসর তিনি আবার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব এবং সংস্কৃত শিক্ষা করতে থাকেন। ১৯১৩-১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রিস্টাব্দে হারভার্ডে দর্শন বিভাগে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন, কিন্তু ট্রাভেলিং ফেলোশিপ পেয়ে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বক্ষণে জার্মানিতে কাটান।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ডের Merton কলেজে গ্রীক দর্শন অধ্যয়ন করতে আসেন। ঐ সময়ে তিনি ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখতে থাকেন। লিবনিজ ও ব্র্যাডলির উপর দুটি স্মরণীয় প্রবন্ধও তিনি ঐ সময়েই রচনা করেন। কবিতায় তাঁর প্রথম পরিণত রচনা হচ্ছে Alfred Prufroch-এর প্রেমের কবিতা; বেরোয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময়েই তাঁর বিবাহ হয় এবং ঐ সময়েই লন্ডনের নিকটস্থ হাইগেটস স্কুলে ফরাসী, ল্যাটিন, গণিতশাস্ত্র, ড্রইং, সন্তরণ, ইতিহাস, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করতে থাকেন। এর পর লয়েডস ব্যাঙ্কে কিছুদিন চাকরি করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগে চাকরি পেয়েও স্বাস্থ্যের অজুহাতে বঞ্চিত হন।

১৯১৭ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত এলিয়ট 'এগোয়িস্ট' পত্রের সহকারী সম্পাদকতা করেন; এবং 'এথেনিয়ান' পত্রে অনেক প্রবন্ধাদি লেখেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রৈমাসিক পত্র 'ক্রিটেরিয়েনের' সম্পাদক পদে বৃত হন। এখন তিনি 'ফেবার অ্যান্ড ফেবার' নামক পুস্তক প্রকাশালয়ের একজন ডিরেক্টর।

তাঁর প্রধান প্রধান রচনা

কবিতা : The Waste land (1922) ; Ash Wednesday (1930); East Coker (1940); Burnt Norton (1941); Dry Salvages (1941); Poems (1909-25); Later Poems (1925-35)

নাটক : Murder in the Cathedral (1935); Family Reunion (1939);

প্রবন্ধের বই : Homage to John Dryden (1928); Selected Essays (1917-32); Elizabethan Essays (1908); Essays in Criticism; An Essays on Poetic Drama; The Sacred Wood.

AMARBOI.COM

বর্তমান সভ্যতা কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত তার বিশ্লেষণ করে দেখলে, এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার যৌক্তিকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা হবে। এই সভ্যতা যেন নিজে যা নয় তার চাইতেও বেশি বলে নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত। এলিয়ট এর বিরুদ্ধে বজ্রসম, তীব্রতম অভিযোগ এনেছেন; তাঁর Waste Land কবিতা-পুস্তকে তিনি এই সভ্যতার স্বরূপ, এই সভ্য মানুষের খাঁটি রূপ নির্মমভাবে উদঘাটিত করেছেন। এই সভ্যতা যে কতখানি অসার, তাকে নিয়ে গর্বান্ধ মানুষ যে কত অকিঞ্চিৎকর, কবি তা নির্মমভাবে নগ্ন করে দেখিয়েছেন। এই দেখানোর মধ্যে অবশ্য একটা দুঃখবাদের রেশ, নৈরাশ্যের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে যা মানুষকে আনন্দ না দিয়ে দেবে বেদনা। কিন্তু এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য যে, প্রচলিত মেকি অথচ দুর্বার এক সভ্যতা-স্রোতের প্রতিকূলে মুষ্ঠি দৃঢ়বদ্ধ করে দাঁড়িয়েছেন তিনি একা। কিন্তু আজ আর তিনি একা নন। তাঁর বজ্রদৃঢ় অভিযোগই প্রধানত এ যুগের সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।

ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের বিবর্তনে এলিয়টের দান অসামান্য। ১৯১১ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আধুনিকপন্থী কবিদের রচনা নিয়ে জর্জিয়ান পয়েট্রি নামে কতকগুলি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে এবং ইংরাজী কাব্যে সেগুলি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। এই কবিগোষ্ঠীর অন্যতম রূপার্ট ব্রুক যুদ্ধের কবিতা লিখে খ্যাতি লাভ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং যুদ্ধেই নিহত হন। এই দলের আরো একজন কবি, উইলফ্রেড ওয়েন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। এঁদের মধ্যে সিগফ্রিড সেশুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেন এবং সেখানকার লেখা কিছু কবিতা সঙ্গে করে আনেন। সেগুলি ছাড়া, ঐসময়ের এদলের লেখা কবিতা যুগের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধবদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ তাঁরা যে যুগে বাস করতেন, সে যুগের প্রকৃত জগতের কোন ধারণাই সেগুলিতে পাওয়া যায়নি।

এই অধোগতিকে দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন বাংলা কাব্য সাহিত্যের অধোগতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। তখন ফ্যাসিবিরোধী গান ও কবিতা হয়ে পড়েছিল বাংলা কবিতার নিরিখ। যা হোক, তখন চলছিল শ্রেণি-সংগ্রাম আর অতৃপ্ত সাম্রাজ্যবাদের লড়াই। চিন্ত রাজ্যের ভিত্তি তখন বিপ্লবমুখী সমাজ-বিশ্লেষণ, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণী ধারণা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কলরব প্রভৃতির অভিঘাতে প্রায় নড়ে উঠেছিল। জর্জিয়ান কবিরা এইগুলিকেই গেঁথে গেঁথে কবিতা সৃষ্টি করে চললেন। কিন্তু এলিয়ট প্রগতিপন্থী হয়েও গড্ডলিকা প্রবাহে পা বাড়াতে অস্বীকার করলেন। এঁদের থেকে তাঁর সাহস যেমন ছিল অধিক, তেমনি সত্যিকার বুদ্ধি ও মননের দিক থেকেও তিনি ছিলেন তাঁদের অনেক ওপরে।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বই Prufroch এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে Poems বের করলেন। এই দুটি বই সেই সময়ের কবিতা লেখার ফ্যাশনকে অগ্রাহ্য করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেই কবিতাগুলিতে অভ্রান্ত সিনিসিজম-এর যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল, অত্যল্পকালের মধ্যেই তা বুদ্ধিজীবী গণ-মানসে বিশেষ আবেদন জাগিয়ে তুললেন। যেন তারা এইরকম সুর শোনার জন্যেই এত দিন কান পেতে ছিলেন।

তার পর বেরোয় তাঁর যুগান্তকারী কাব্য গ্রন্থ Waste Land ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। এ বই বেরুলে তরুণ সমাজ তাঁকে আদর্শ প্রেরণার প্রতীকরূপে গ্রহণ করল এবং তাদের মনোরাজ্যে তিনি একক কাব্যস্রষ্টারূপে স্থান পেলেন। এই বইটিতে প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের গতিপ্রকৃতির অসারতা নির্মম রেখায় রূপ পেয়েছে; সভ্যতার চক্র আটকে পড়েছে, তার আর ঘুরবার ক্ষমতা নেই, এই ভাবটি কবি তাঁর কাব্যের লাইনগুলিতে নিবিড়ভাবে রূপদান করেছেন। কিন্তু এই ভঙ্গুর সভ্যতা আর জীবন্মৃত মানুষ চিত্রিত করতে করতে তিনি মাঝে মাঝে আপনাকে শুধিয়েছেন 'কবি একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।' সেই বিশ্বাসের ছবিই তাঁর Ash Wednesday বইখানা।

এলিয়ট ইংলন্ডের গত বিশ বছরের চিন্তাধারাকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করেছেন। গত বিশ বছর ধরে যাঁরা কবিতা লিখে আসছেন, তাঁদের মধ্যে সমালোচক হিসাবেও আজ তাঁর আধিপত্য সর্বজন-স্বীকৃত। চিন্তাশীল মানবমনে তিনি ধর্মবোধ উজ্জীবনার্থে নিজের পড়াশোনা ও প্রতিভাকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

কাব্যশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ। সর্বযুগের কবিতা সম্বন্ধেই তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি। তাঁর ছন্দ ও ব্যঞ্জনা স্বভাবসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্তিতে প্রবাহিতঃ যেন মনের ঐকান্তিকতা থেকে বিনা চেষ্টায় এগুলি বেরিয়ে আসে। তাঁর রচনা ও জীবন দর্শন ভাষার দিক বিবেচনায় ইংরাজী ও আমেরিকান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে বিশ্ব-সাহিত্যকে।

সাপ্তাহিক দেশ : নভেম্বর ১৩, ১৯৪৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজের কাল

ইতিহাস সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। ইতিহাসের মধ্য দিয়া কোন ব্যক্তি বা জাতির অবমাননা করিলে সেই অবমাননার জন্য দায়ী সাহিত্যই। সাহিত্য ইতিহাসকে বুকে করিয়া রাখিয়াছে, কাজেই সে বুকে করিয়া রাখিয়াছে ইতিহাসজাত সত্য-মিথ্যার সকল দায়িত্বকে। সিরাজের প্রতি বিদেশীয়গণের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় ঐতিহাসিকগণেরও কেহ কেহ ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন। এইজন্য এদেশীয় সাহিত্যের লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত।

সিরাজ সম্বন্ধে যিনিই আলোচনা করুন না কেন, তাঁহার প্রতি ইতিহাসের অবিচার-প্রসঙ্গে দেশীয় ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিকগণ কর্তৃক কৃতকর্মের কথা প্রসঙ্গতঃ আলোচনাতে উল্লেখ হইবেই। ইংরাজগণ স্বার্থের খাতিরে যাহা রচনা ও রটনা করিয়াছেন, কেহবা অনুরূপ মিথ্যা রচনা ও রটনা করিয়া এবং কেহবা ইংরাজের পদাঙ্কানুসরণে তাহাদের মিথ্যা কথা সমর্থন করিয়া ইতিহাস-অবমাননা ও সাহিত্যের মানহানির দায়ে পড়িয়াছেন। তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া এখন আর ফল নাই, কারণ তাহাদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় হইতেই যথেষ্ট নিন্দা করা হইয়াছে। মীরজাফর জগৎশেঠ উমিচাঁদ প্রভৃতি দুর্ভাগাদের প্রতি জাতির যে-রকম পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাইয়াছে, বক্ষ্যমান লেখকগণের প্রতি তাহা অপেক্ষা কম প্রকাশ পাইয়াছে বলা যায় না। কাজেই বহুবার বলা কথার পুনরাবৃত্তি না করিয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা বেশি লাভবান হইব।

বহুদিন ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমাজগত ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া আছে। ধর্মগতভাবে কতকটা না-বোঝা এবং কতকটা ভুল-বোঝা এই ব্যবধানের মূল-কারণ। হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির মধুভাণ্ড 'চন্দ্রচূড় জটজালে' আবৃত, স্বল্পকালের সাধনায় অপর ধর্মাবলম্বী কাহারও উহার সম্বন্ধে অবগতির উপায় নাই। আর হিন্দুগণের একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, সাধারাণ অ-বিদ্বান ও স্বল্পবিদ্বান হিন্দুগণ ধর্মের কিছুমাত্র না বুঝিয়া কেবল বিশ্বাসের জোরেই ধর্মকে ধারণ করিয়া আছে। ধর্ম তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে একথা বলা যায় না। এইরূপ একটুখানি বিশ্বাসমাত্রকে সম্বল করিয়া অপর ধর্মের সাধারণ ব্যক্তিবর্গ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সত্যসত্য শ্রদ্ধাপোষণ করিবে এতখানি আশা করা যায় না। মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য হইলেও একটু স্বাতন্ত্র্য আছে।

সকলেই জানেন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের দিক দিয়া যোগসূত্র স্থাপনে খ্রিস্টান মিশনারীদের 'মিশন' যতখানি কাজ করিয়াছে অপর কেহ সেরূপ করেন নাই।

পাদরীদের সুপ্রচারের প্রথম অবস্থাকে স্মরণ করুন। মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে হয়ত তাহারা ইংরেজিতে অনূদিত গ্রন্থাদির সাহায্যে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ যতনা দুরূহ তাঁহাদের উপযোগী গ্রন্থপ্রাপ্তি আরও দুরূহ। যাহা হউক, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইহাতে বাধা জন্মায় নাই। হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগত ঘটনাবলীর কতকগুলিকে মিথ্যা, কদর্য করিয়া এবং কৃষ্ণচরিত্রের পাদরীদের অগম্য কতকগুলি মিথ্যা দোষত্রুটি বাহির করিয়া তাঁহাদের যাত্রাপথের সহায় করিয়া লইলেন এবং ঐ সঞ্চয়কে সম্বল করিয়া নিরক্ষর সাধারণ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। হিন্দু ও মুসলমান কেহ কাহারও ধর্ম সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ ছিল না, পাদরীদের মধ্যস্থতায় উভয়ে উভয়কে কিছু কিছু বুঝিতে পারিল–পরস্পর পরস্পরকে নিন্দা করিবার মুখরুচক উপাদান কিছু কিছু তাহারা পাদরীদের প্রসাদাৎ প্রাপ্ত হইল। ইহাতো গেল অজ্ঞসাধারণের কথা। প্রাজ্ঞজনের মনে এইরূপ হীন প্রচার বেশি ক্রিয়া করে নাই।

প্রাজ্ঞ হিন্দুগণের কেহ কেহ প্রবল অনুসন্ধিৎসাবলে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনার প্রয়োজন বোধ করিলেন। স্বীয় ধর্মের উদারতার বশে পরধর্ম হইতে রত্ন আহরণের প্রেরণা তাঁহাদের সেই প্রয়োজনবোধে শক্তিসঞ্চার করিল। আরবী শিক্ষার কষ্ট স্বীকারের পরিবর্তে, ইংরেজিনবীশ তাহারা, ইংরেজি ভাষায় ইউরোপীয়দের লিখিত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ গ্রন্থাদিরই তাহাদের কেহ কেহ আশ্রয় লইলেন। ফলে তাহারা স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে বর্ধিত করিবার পরিবর্তে ভ্রান্ত জ্ঞান দ্বারা মনের মণিকোঠা পূর্ণ করিলেন। সেই জ্ঞান লইয়া তাহারা আবার গ্রন্থাদিও লিখিলেন। সেই চর্চা মুসলমানদের মনে গৌরববোধ অপেক্ষা বেদনারই সঞ্চার করিল। মুসলমান প্রাজ্ঞগণ কিন্তু পূর্বাপর থেকে অনুরূপ চেষ্টা হইতে বিরত রহিলেন। তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম সম্বন্ধে বুঝিবার বা গ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষান্ত রহিলেন। উক্ত প্রাজ্ঞগণ মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে যে প্রমাদে পড়িয়াছিলেন, মুসলমান নরপতি সিরাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রমাদেই পড়িলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়ত ভালই ছিল, ইংরাজের মুখে ঝাল খাইতে গিয়াই হয়ত তাহারা এইরূপ ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন।

শুদ্ধ সাহিত্যে যাঁহারা সিরাজের প্রতি অবিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্বর্গীয় কবি নবীন সেনের নাম উক্ত হইয়া থাকে। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পর্যন্ত নবীন সেনকে ক্ষমা করেন নাই– পরবর্তীয়গণকে যে ক্ষমা করিবেন না ইহা বলাই বাহুল্য। নবীন সেন ঐতিহাসিক উপকরণ লইয়াছেন ইংরেজদের নিকট হইতে ধার করিয়া, আর কাব্যিক উপকরণ লইয়াছেন, কিছুটা স্বকপোলকল্পনা হইতে আর কিছুটা বিজাতীয় কবির কাব্য হইতে। এই উক্তি সম্বন্ধে অনেকেই যে একমত তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু একটানা একটি স্বজাত্য ও স্বাদেশিকতাবোধের সুর কাব্যখানকে পাঠকসমাজে বহুকাল ধরিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

পলাশীর যুদ্ধ কাব্য লিখিয়া নবীন সেন দেশের উপকার ও অপকার দুইই করিয়াছেন। উপকারের স্বপক্ষে অধিক কিছু না বলিয়া দেশদরদী পাঠকগণের ছাত্রজীবন স্মরণ করিতে বলি। পাঠ্যাবস্থায় অধিকাংশ যুবকই নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" বলিতে অজ্ঞান। জাতীয় সাহিত্যের উজ্জ্বল মণিরূপে গ্রন্থখানি এককালে বহু কর্তৃক পঠিত হইত। ইহার এই বহুলপ্রচার মিথ্যাপ্রচারে বহুল সহায়তা করিয়াছে। স্বাদেশিকতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সিরাজ সম্বন্ধে মিথ্যা বক্তব্যাদিও সুললিত ছন্দে বিস্তৃতরূপে প্রচার লাভ করিয়াছে– একথা মিথ্যা নয়। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে, সিরাজ সম্বন্ধে যত মিথ্যা কথাই আমরা বহিপত্রে পাঠ করি না কেন, সর্বমিথ্যাকে আড়াল করিয়া পাঠের পরবর্তী সময়ে বাংলার খাঁটি সিরাজকেই স্ব-দীপ্তিতে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী ৬০
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা আজকার কোন পাঠকের মনে বিন্দুমাত্রও প্রভাব বিস্তার করে না। আর আমরা মিথ্যাকে পদদলিত করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিবার পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছি।

বাংলা সাহিত্য সিরাজ সম্বন্ধে বলিয়া যতখানি কলঙ্কিত হইয়াছে, আমাদের মনে হয় তদপেক্ষা অধিক কলঙ্কিত হইয়াছে সিরাজ সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ না বলিয়া। সিরাজ ও সিরাজের সমসাময়িক কাল সম্বন্ধে সাহিত্যের বাক্যস্ফুটের অপ্রাচুর্য অমার্জনীয় ত্রুটি! ঘটনাবহুল সিরাজের কালের সম্যক পরিচয় ও তৎপ্রসঙ্গে জাতির ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশে বহুখণ্ড গ্রন্থ, রাশি রাশি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচিত হওয়ার পথ রহিয়াছে। জাতির জীবনে এতবড় ঘটনা বা দুর্ঘটনা কি আর হইতে পারে? অদ্যাবধি সিরাজের যুগ অন্ধকারে রহিয়াছে। বহুকালের এই পুঞ্জীভূত মিথ্যা সরাইয়া সিরাজকে তাঁহার স্বদীপ্তিতে প্রতিভাত করা দুই একজন ঐতিহাসিকের কাজ নহে। আজ ইংরাজ জাতি এইরূপ অবস্থায় পতিত হইলে কেবল সাহিত্যের প্রাচুর্যের মধ্য দিয়াই তাহারা এতদিনে জাতির ভাগ্য নির্ণয় করিয়া লইত।

সিরাজের কাল জাতির বক্ষে বেদনাদায়ক কাল হইলেও অগৌরবের কাল নহে। চক্রান্তকারীদের শয়তানীর অনুকূলে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নরপতি আত্মসমর্পণ করেন নাই। আর রাজা হইয়া বণিকের নিকট পরাজয় বরণও করেন নাই। প্রতিকূল অসস্থাবৈগুণে চতুর্দ্দিককার ন্যাক্কারজনক পারিপার্শ্বিকতা হইতে সরিয়া পুনরায় সমরের আয়োজন করিবার কালে জ্ঞাতিশত্রুর হস্তে নিহত হন। এদেশে গবেষকের অভাব নাই। লেখকগণের সময়েরও অপ্রাচুর্য নাই। দেবাসুর সংগ্রামে জগতের কতদূর ক্রমবিকাশ হইল, যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয়কাল ঠিক কখন—এ সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক গবেষণায় মস্তিষ্ক ব্যয় করিবার মত লোকের তো এদেশে অভাব নাই।

দেশে এত গবেষক থাকা সত্ত্বেও সিরাজের কাল দেশের সম্মুখে এখনও যথেষ্টরূপে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল না, ইহাই দুঃখের বিষয়। সিরাজের কাল নিয়া গবেষণা করিলে এবং সত্য তথ্যাদি নির্ভীকভাবে প্রকাশিত করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকম্পালাভের আশা কম এবং সরকারের বিরাগভাজন হইবার আশা বেশি—তর্কের খাতিরে এ সকল কথা স্বীকার করিয়া নিলেও, আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তির তোয়াক্কা না রাখিয়া এবং সরকারি বিরাগকে কদলীপ্রদর্শন করিয়া অনেকে অনেক কিছু লিখিয়াছেন একথা মিথ্যা নহে। জ্ঞানী লোকে বলেন—যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরে। একটা গোটা দেশের পতন-ইতিহাসকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আরোপিত মিথ্যা কলঙ্কজাল হইতে মুক্ত করিয়া উত্থানের নির্দেশ দানই কি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতীয়তা নয়? দেশের দুঃসাহিক দল সিরাজ-সমসাময়িক মিথ্যার ধূলিজাল অপনোদনে সত্য কথা অকপটে বলিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন না কেন? এই কেনর উত্তর কে দিবে। অথচ এদেশেরই ইতিহাস, এদেশের সাহিত্য গর্ব করিয়া বলিয়া রাখিয়াছে—

মোরা সত্যের' পরে মন
আজি করিব সমর্পণ,
মোরা পূজিব সত্য খুঁজিব সত্য
সেবিব সত্য ধন।

সূত্র : সাহিত্য প্রসঙ্গ, মাসিক মোহাম্মদী, সিরাজস্মৃতি সংখ্যা, ১৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাব্য-সমালোনা

একটি চিঠি

From Adwaita Malla Barman
Gokanghat, Tripurah
23.6.34

প্রিয় ভ্রাত

আপনার কাব্যখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। এ সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তা আমি এই পত্রে আপনার নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। আশা করি, আপনি আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন না। কাব্যখানার যেখানে যেখানে কোন দোষ, বৈসাদৃশ্য, ছন্দ ত্রুটি প্রভৃতি আছে, সেইখানে আমি চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি, সংশোধনের ভার আপনার স্কন্ধেই চাপাইলাম।

কাব্য ছাপানো সম্বন্ধে এটুকু বলিতে পারি... কাব্য মন্দ হয় নাই, নতুন লেখকের পক্ষে আশাতীতই হইয়াছে, তবু সর্বতোভাবে প্রকাশের উপযুক্ত হয় নাই। এইজন্য বলি, আপনি ইহা ছাপাইবার চেষ্টা করিবেন না। নিরাশ হইবেন না, অনবরত লিখিতে থাকুন, আপনি অল্প সময়েই বেশ নাম করিতে পারিবেন, এ বিশ্বাস এবং ভরসা আমার আছে।

এখানে কবিতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাব্যকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া ফেলুন :

১। গীতিকাব্য (Lyrical Poems) ২। খণ্ডকাব্য (Narrative Poems) ৩। মহাকাব্য (Epic).

আপনাকে প্রথমতঃ গীতিকবিতায় হাত পরিষ্কার করিতে হইবে। Picture-ই গীতি কবিতার প্রাণ। কাজেই আপনি Picture ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। তারপর খণ্ড কাব্যে হাত দিবেন। অতীত বা বর্তমান ঘটনাবলী লইয়া আপনি খণ্ডকাব্য লিখিতে পারেন, তবে অতীতকে নিয়া লেখাই প্রথমতঃ আপনার সুবিধাজনক হইবে। কারণ অতীতের উপর লেখকের কল্পনাকে উদ্দাম গতিতে চালানো যায়। বর্তমান সম্বন্ধে অনেক বিপদের আশঙ্কা, ইহা আপনি ক্রমে ক্রমে বুঝিবেন। কিন্তু সাবধান, এখন আপনি epic এ হাত দিবেন না। উহা ভয়ানক কঠিন কাজ। বিশেষ সিদ্ধহস্ত হইলে পর আপনি epic লিখিতে পারেন। হিন্দুশাস্ত্রে epic সম্বন্ধে বলে যে, উহাতে at least নয়টি সর্গ থাকিবে। অতীত হইতে material সংগ্রহ করিতে হইবে। Stytle খুব grand হওয়া চাই। একাধিক ছন্দ ব্যবহার করা যায় না। ইত্যাদি। Narrative বা epic এর materials আপনি হিন্দু বা মুসলিম mythology কিংবা history হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। কাব্যের পূর্বাপর যাহাতে একটা বিশেষ সামঞ্জস্য থাকে সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকা চাই। ভাষা বা expression এর উপর যথেষ্ট দখল থাকা চাই। আপনার তাহা আছে এবং আপনি অবশ্যই কৃতকার্য হইবেন। প্রকৃতিকে লইয়াই কবির কারবার, আর "nature is itself a grand picture" এই জন্যেই বলিতেছিলাম, আপনি picture ফুটাইতে বিশেষ যত্ন করিবেন। আর এক কথা– lyrics গুলি সামান্য বিষয়ের উপরই লিখিবেন। বড় বড় জিনিসের উপর রস ফুটাইয়া তোলাই কবির কৃতিত্ব। এ সম্বন্ধে আপনি যতই culture করিবেন ততই আনন্দে আত্মহারা হইবেন।

কাহাকে follow করিবেন না। সর্বদা সর্বত্র আপন ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিবেন। অনুসরণ এবং অনুকরণ এর প্রভেদটুকু আপনি অবশ্যই জানেন। আপনি মধুসূদনের Blank verse এর অনুকরণ করিতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়তা বা মরমীবাদ বা mysticism এর অনুকরণ করিলে ইহা দোষের কারণ হইবে।

আর একটি মাত্র কথা বলিয়াই চিঠি শেষ করিব। সাধনা না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে নাই। আর সাধনা যাহা করিবেন তাহা নীরবে নীরবেই করিবেন। আগুন কখনো ছাই ঢাকা থাকে না। আপনার প্রতিভাও একদিন নিশ্চিত সুধীজন সমাজে আদৃত হইবে। ইহা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। আমার প্রতি যদি আপনার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ও ভালবাসা থাকে তবে আমার কথায় বিশ্বাস করুন, অনবরত লিখিতে থাকুন।

As a true friend আমি আপনাকে আমার সব বক্তব্য বিষয়গুলো খোলাখুলি ভাবে লিখিলাম, ইহাতে যদি আপনার মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়া থাকে তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ইতি

আপনার

শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ

টীকা :

পত্রটির প্রাপক কবি মতিউল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া-তে মল্লবর্মণের বন্ধু ছিলেন। চিঠি লেখার সময় অদ্বৈত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির আর মতিউল ইসলাম দশম শ্রেণির ছাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~